দীপাবলি সংখ্যা

- কথামৃতর ইতিকথা
- ন্যানোর আত্মকথা
- রাজনীতি, বিনোদন
- খেলা, ভ্রমণ
- স্পেশ্যাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস

২৪ অক্টোবর, ২০২২

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

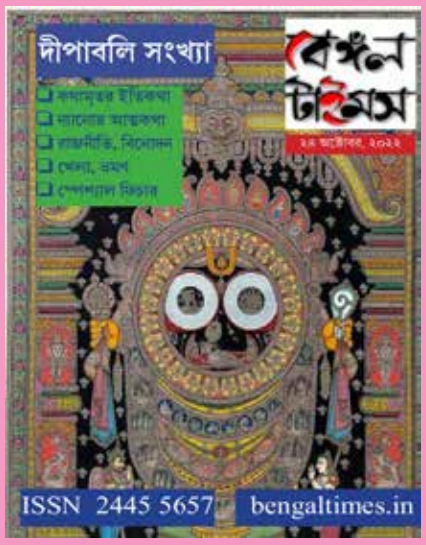

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী

কথামৃতর ইতিকথা
❑ কুন্তল আচার্য
হারিয়ে যাওয়া পান্নালাল
❑ দিব্যেন্দু দে

রাজনীতি

যত পাজি ওই বুদ্ধবাবু
❑ স্বরূপ গোস্বামী
রাবার স্ট্যাম্প কি শুধুই খাড়ো?
❑ সিদ্ধার্থ গুপ্ত

বিনোদন

কৌশিক সেনের নাম কেন যে বারবার টেনে আনা হয়!
❑ রক্তিম মিত্র

স্পেশ্যাল ফিচার

রূপকথার বুড়িমা
❑ সংহিতা বারুই
আজই হোক প্রেম দিবস
❑ অনন্যা পোদ্দার
স্মার্টফোন থাকা মানেই সে স্মার্ট!
❑ প্রসূন মিত্র

ফিরে দেখা

কিশোর মনে ঝড় তোলা সেই 'শত্রু'
❑ সুমিত চক্রবর্তী
স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যা
❑ ময়ূখ নস্কর

খেলা

দাদাগিরির মোক্ষম গুগলি
❑ প্রশান্ত বসু
খেলার মাঠে ঘৃণার চাষ খুব জরুরি!
❑ সোহম সেন

ভ্রমণ

পড়শি রাজ্যে সাতটা দিন
❑ রাজর্ষি সরকার
আমরা সবাই চন্দ্রাহত
❑ অরূপ ঘোষ
কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং
❑ নূপুর রায়
বাংলার বাইরে অন্য এক ‘বাংলা’
❑ সুমিত চক্রবর্তী

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন— ২৪৪৫ ৫৬৫৭

ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com, ওয়েবসাইট: bengalttimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

অন্ধকারের উৎস হতে..

বর্ষাকাল সেই কবে চলে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির ভ্রুকুটি যায়নি। শারদোৎসবেও বৃষ্টির চোখরাঙানি। দীপাবলির আগেও সেই এক পূর্বাভাস। বৃষ্টি নাকি ভাসিয়ে দেবে উপকূল। জেলায় জেলায় নাকি পুজো পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা। সেইসঙ্গে ঝড়ের বার্তা। শেষপর্যন্ত কী হবে, পরিষ্কার নয়। হয়ত ঝড় বাঁক বদল করে অন্য কোনও উপকূলে বা অন্য কোনও রাজ্যে পৌঁছে যাবে। এক দলের মানুষ যদি দল বদলে রাতারাতি এদল থেকে ও দলে চলে যেতে পারে, তাহলে ঝড় বৃষ্টিই বা এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে কেন যেতে পারে না!

পুজোর পর রাজনৈতিক তরজা যথারীতি শুরু। একটা বিতর্ককে সরিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছে অন্য বিতর্ক। এদিকে পুজোর আগে সিনেমা হলে যে একঝাঁর বাংলা ছবি এসেছিল, সেগুলো একে একে হল থেকে বিদায়ও নিয়েছে। অনেকে দেখেছেন। অনেকের হয়ত অনেক ছবি দেখা বাকিও থেকে গেল। কখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে, সেই অপেক্ষা।

পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেক অনুষঙ্গ। তা হল, ভ্রমণ। কেউ কেউ পুজোর মাঝেই বেরিয়ে

পড়েছিলেন। আবার কেউ পুজো শেষ হতেই পাড়ি দিয়েছেন হাওয়া বদলে। কেউ ভিনরাজ্যে। কেউ আবার রাজ্যের মধ্যেই। সেইসব টাটকা কিছু ভ্রমণ কাহিনি আর অনুভূতি যদি ভাগ করে নেওয়া যায়! মন্দ হয় না। ওদিকে আবার জোড়া বিশ্বকাপের হাতছানি। একদিকে অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হয়ে গেছে টি২০ বিশ্বকাপ। এই লড়াই শেষ হতে না হতেই কাতারে শুরু হয়ে যাবে ফুটবল বিশ্বকাপ। বাঙালি আবার ভাগ হয়ে যাবে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনায়। সবমিলিয়ে প্রায় আড়াই বছর ধরে থমকে থাকা একটা পৃথিবী আবার যেন স্বমহিমায় চলতে শুরু করেছে। অন্ধকার থেকে যেন জীবনের আলোয় ফেরা।

পুজো সংখ্যার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হাজির দীপাবলি সংখ্যা। গতবারের মতোই ছাপা হরফের পুজো সংখ্যা এবার ছিল বাড়তি আকর্ষণ। রাজনীতি, খেলা, সাহিত্য, সিনেমা সর্বত্রই নানা ঘটনাপ্রবাহ থাকবে। বিতর্ক থাকবে। সেগুলোকে সীমিত পরিসরে একটু ছুঁয়ে দেখা। পাশাপাশি পুরনো কিছু নস্টালজিয়াকে একটু উস্কে দেওয়া। কিছু পুরনো বিভাগের পাশাপাশি কিছু নতুন বিভাগকেও শামিল করার একটা চেষ্টা। স্বল্প পরিসরে, স্বল্প সময়ে আবার ডানা মেলল বেঙ্গল টাইমস। সেই উড়ানে আপনাদেরও সাদর আমন্ত্রণ।

কথামৃতর ইতিকথা

কুন্তল আচার্য

চাটুজ্যে বামুনের বদ্যি পাবলিসিটি অফিসার। তখনকার দিনে বেশ চালু একটা কথা। এই চাটুজ্যে বামুনই বা কে? আর বদ্যি পাবলিসিটি অফিসারটিই বা কে? প্রথমজন গদাধর চ্যাটার্জি। যাঁকে বাঙালি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে চেনে। আর দ্বিতীয়জন মহেন্দ্র গুপ্ত। পেশায় শিক্ষক। পরবর্তীকালে শ্রীম নামে পরিচিত। তাঁকে কি লেখক বলা যায়! যদিও তিনি নিজে নিজেকে কখনও লেখক বলে মনে করতেন না। কিন্তু একটু একটু করে বাংলা ভাষার একটি আকর গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। বইয়ের নাম? শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত।

সারা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা। কত হাজার হাজার সন্ন্যাসী ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এত কিছুর পরেও রামকৃষ্ণ আমাদের কাছে অনেকটাই অধরা থেকে যেতেন যদি এই মহেন্দ্র গুপ্ত না থাকতেন। রামকৃষ্ণ বিচিত্র সব নামে তাঁকে ডাকতেন। কখনও বলতেন মাস্টার, কখনও হেডমাস্টার। কখনও বলতেন ইংলিশম্যান, আবার কখনও মহেন্দ্র মাস্টার। এই মাস্টারের দীর্ঘ প্রচেষ্টাতেই বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অনেকে বলতেই পারেন বিবেকানন্দের কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই বিবেকানন্দের বড় একটা সময় কেটেছে ভারত ভ্রমণ ও বিশ্ব ভ্রমণে। ফিরে আসার পরেও সেভাবে রামকৃষ্ণের কথা প্রচার করার সুযোগ পেলেন কই? বড্ড তাড়াতাড়িই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। তাছাড়া, তিনি নিজেই এক জ্বলন্ত সূর্য। নিজেই কিংবদন্তি। বেদ-বেদান্ত থেকে শুরু করে ধর্ম-পুরাণ নানা ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যা শোনার জন্যই বসে থাকতেন ভক্তরা। কিন্তু মহেন্দ্র গুপ্ত নিজে সেলিব্রিটি ছিলেন না। ফলে, তিনি এক মুগ্ধ ভক্তের মতোই অনন্ত সময় ধরে রামকৃষ্ণকে কাছ থেকে দেখে গেছেন। বাড়ি ফিরে সেইসব কাহিনি লিখে গেছেন। লিখতে লিখতে কখনও রাত পেরিয়ে ভোরও হয়ে গেছে। ডায়েরিতে লিখে রাখা সেইসব ঘটনা কখনও বই হয়ে বেরোবে, লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে, এমনটা তাঁর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

এই মহেন্দ্র গুপ্ত আসলে বিবেকানন্দের শিক্ষক। বিবেকানন্দও তাঁকে মাস্টারমশাই বলেই ডাকতেন। পিতৃবিয়োগের পর অর্থাভাবে বিবেকানন্দ তখন দিশেহারা।

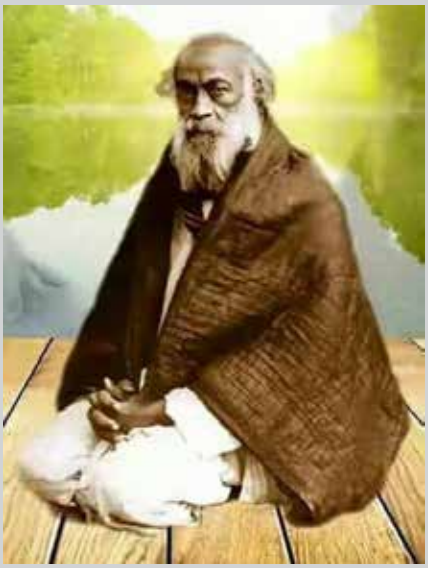

কিন্তু এদিকে অর্থাভাব বেড়ে চলেছে মাস্টার মশাইয়ের। স্কুল থেকে এবার কাজ নিলেন কলেজে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে। পরে চাকরি নিয়েছিলেন সিটি কলেজেও। পড়াতেন ইংরাজি, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস। একসময় একসঙ্গে তিনটি স্কুলে কাজ করেছেন। তিনটি স্কুলের উপার্জন খরচ করতেন তিনটি খাতে। একটি স্কুলের টাকা যেত বরাহনগরের মঠে, গুরুভাইদের সেবায়। একটি স্কুলের টাকা দান করতেন সারদামণি ও সন্ন্যাসীদের জন্য। আরেকটি স্কুলের টাকা খরচ হত নিজের সংসারের কাজে।

হেডমাস্টার মহেন্দ্র গুপ্তই তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন মেট্রোপলিটন স্কুলে। সেটি ছিল বিদ্যাসাগরের তৈরি করা স্কুল। বিদ্যাসাগর তৈরি করলেও স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন তাঁর জামাই। দৈনন্দিন কাজ সেই জামাই বাবাজীবনই দেখাশোনা করতেন। তাঁর আবার নরেনকে নানা কারণে ভাল লাগত না। ফলে, এই চাকরি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি নরেন। অবশ্য মাস্টারমশাইও বেশিদিন সেই স্কুলে রইলেন না। একসময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনিও মেট্রোপলিটন স্কুল ছেড়েই দিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ? তিনি নাকি মন দিয়ে স্কুল করছেন না। মাঝে মাঝেই রামকৃষ্ণের কাছে চলে যাচ্ছেন। সেই চাকরি ছেড়ে যখন রামকৃষ্ণের কাছে এলেন, রামকৃষ্ণ বলে বসলেন, বেশ করেছো, বেশ করেছো, বেশ করেছো।

এবার কথামৃতে আসা যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর আলাপ ১৮৮২-র ফেব্রুয়ারি নাগাদ। রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮৮৬-র আগস্টে। অর্থাৎ, এই সাড়ে চার বছর রামকৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছেন। বয়সে তিনি রামকৃষ্ণের থেকে ১৮ বছরের ছোট। সময় হলেই চলে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। সবকিছু খুঁটিয়ে শুনতেন। সবসময় যে রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে খোশগল্প করতেন, এমন নয়। নানাপ্রান্ত থেকে ভক্তরা আসতেন। সেই তালিকায় তখনকার সমাজের দিকপালরাও ছিলেন। তাঁরা রামকৃষ্ণকে কী বলছেন, রামকৃষ্ণ তাঁদের কী বলছেন, সব খেয়াল রাখতেন। রাতে বাড়ি ফিরে বসে যেতেন ডায়েরি লিখতে। সবকিছু খুঁটিয়ে লিখে রাখতেন। এমনকী লিখতে লিখতে কখনও সকাল হয়ে যেত। অনেক সময় অনেককিছু হয়ত মনে পড়ছে না। মনের

মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা। বারবার মনে করার চেষ্টা করতেন। হয়ত ঘুমের মাঝেই মনে পড়ল। অমনি উঠে পড়ে লিখে নিতেন।

কিন্তু হঠাৎ এই ডায়েরি লেখার ইচ্ছে হল কেন? নিজেই জানিয়েছেন, ছোট বেলায় পড়েছিলেন চৈতন্য চরিতামৃত। আবার ডায়েরি লেখার অভ্যেসটাও সেই ছোটবেলার। শুরুতে নিজের কথাই লিখতেন। বন্ধুদের কথা লিখতেন। বাড়ির লোকের কথা লিখতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই মনের ভেতর আমূল এক পরিবর্তন এল। মনে হল, এই মানুষটার কথাগুলো যদি লিখে রাখতে পারি! এভাবেই একটু একটু করে লেখার শুরু। কথামৃতের প্রাণপুরুষ বারবার জানিয়েছেন, কারও জন্য নয়, এই লেখা লিখেছিলাম শুধু নিজের জন্যই। লিখে আনন্দ পেতাম। এটাই ছিল পরম প্রাপ্তি।

এই লেখাকে তিনি যে জনসমক্ষে আনতে চাননি, তা নানা ঘটনা পরম্পরা থেকেই বোঝা যায়। কারণ, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর অন্তত ষোল বছর পর বেরিয়েছে প্রথম খণ্ড। যদি সত্যিই আত্মপ্রচারের জন্য লিখতেন, তাহলে ষোল বছর অপেক্ষা করতেন না। পরের বছরই লিখে ফেলতেন। আসলে, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর এগারো বছর পর তাঁকে নিয়ে ইংরাজিতে একটি পুস্তিকা বেরোলো। তখন অনেকে তাঁকেও পরামর্শ দিলেন লেখাগুলো একটু একটু করে সামনে আনতে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের বেশ কুণ্ঠাই ছিল। তিনি ডায়েরি নিয়ে গিয়ে পড়ালেন সারদা মা-কে। সারদামণি দরাজ প্রশংসা করলেন। বললেন, তোমার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, উনি নিজেই কথা বলছেন। সারদা তখন বেশিরভাগ সময় থাকতেন জয়রামবাটিতে। সেখানেও গুরু মায়ের কাছে ছুটে গেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। সারদার কাছ থেকে সাহস পেয়ে মনে হল, এবার এই ডায়েরির

কিছু অংশ পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করা যায়। বিক্ষিপ্তভাবে বঙ্গদর্শন, উদ্বোধন, হিন্দু পত্রিকা, জন্মভূমিতে বেরিয়েছে। প্রথমে নাম ছিল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলামৃত। পরে নাম হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা। তারপর ১৮৯৯ নাগাদ নাম হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতম। সেখান থেকে নাম হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত। প্রথম বই হয়ে বেরোলো ১৯০২ সাল নাগাদ। সেই বছরই মৃত্যু হল স্বামী বিবেকানন্দের। স্বয়ং রামকৃষ্ণর জীবন নিয়ে বই লেখা হবে, অথচ কোনও প্রকাশক পাননি কথামৃতের লেখক। নিজের টাকা থেকেই বই বের করেছেন। পরের খণ্ডগুলি বেরিয়েছে ১৯০৪, ১৯০৮, ১৯১০ নাগাদ। এই চারটি খণ্ড লেখার পর ২২ বছরের বিরতি। এর মাঝে একের পর এক ঝড়ঝাপটা এসেছে তাঁর জীবনেও। শরীরও ভেঙে পড়েছিল। আর লিখতে পারবেন কিনা, নিজের ভেতরেই সংশয় ছিল। এদিকে, তাঁর লেখা চার খণ্ড বই তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। অবশেষে, পঞ্চম খণ্ড দিনের আলো দেখল ১৯৩২ নাগাদ। সেই পঞ্চম খণ্ড ছাপার অক্ষরে, বই আকারে দেখে যেতে পারেননি। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, তার আগের রাতে দেখেছেন পঞ্চম খণ্ডের ফাইনাল প্রুফ।

শোনা যায়, আরও দু'খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর হয়ে উঠল না। ডায়েরি থেকে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ৭১ বার। বইয়ে ২৫৫

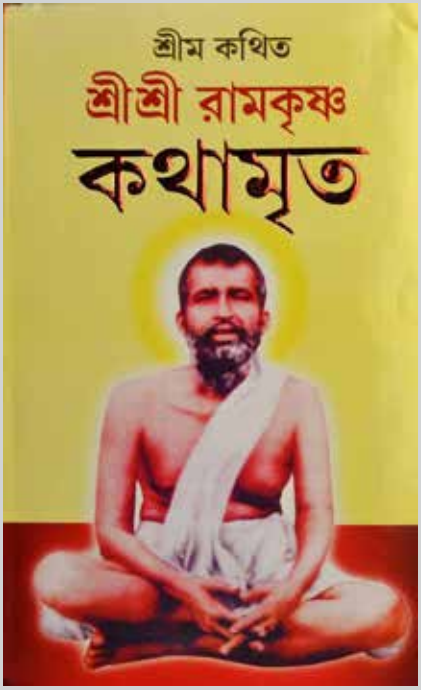

জন ভক্ত ও আগন্তুকের কথা আছে। সেই তালিকায় সেই যুগের দিকপাল লোকেরাও ছিলেন। সাল, তারিখ ধরে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে গেছেন। এমনই ঝরঝরে ভাষা, যে কেউ বুঝতে পারবেন। সহজবোধ্য ভাষার কারণেই বইগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

একটি সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে কত প্রান্তে। একটা জীবনের চারপাশে আরও কত জীবন। আড়ালেই থেকে যান মহেন্দ্র গুপ্তরা। আড়াল থেকে তাঁরা আলো দেখান। সেই আলোয় আরও স্পষ্ট দেখা যায় পরমহংসদেবকে।

অমরত্বই পেয়ে গেল পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত

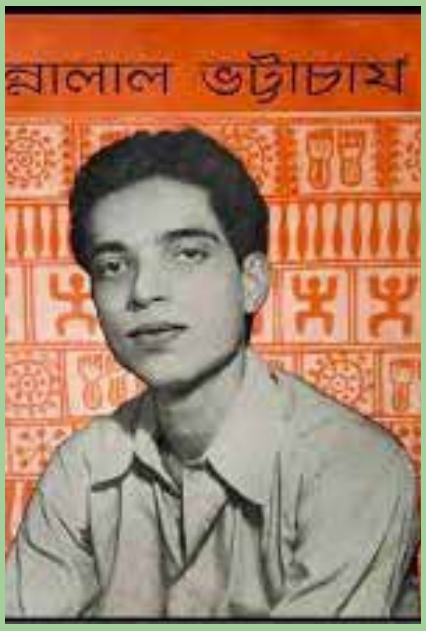

দিব্যেন্দু দে

কালীপুজো এলেই বড় বেশি করে তাঁর কথা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, বাড়িতে বাড়িতে বেজে ওঠে। কার কথা বলছি ? অনেকেই ধরে ফেলেছেন, পান্নালাল ভট্টাচার্য। আমাদের অনেকেরই বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর গান। আমার জন্ম আটের দশকে। বাড়িতে যে খুব একটা ভক্তির পরিবেশ ছিল, এমনও নয়। নতুন টেপ রেকর্ডার এলে যা হয়! যার যেমন পছন্দ, সে তেমন ক্যাসেট কিনে আনে। পান্নালাল ভট্টাচার্যের ক্যাসেটটা কে কিনে এনেছিল, আজ আর মনে নেই। হতে পারে ছোট কাকা। আমার কিশোর বয়সে ওই গান ভাল লাগবে কেন? তখন আমি কিশোর শুনছি, হেমন্ত শুনছি, পরের দিকে কুমার শানু শুনছি। পান্নালালকে কিছুটা বেসুরোই মনে হত। যত সময় এগোলো, গানগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গেল। কেন জানি না, গলাটা একটু একটু ভাল লাগতে শুরু করল। আমার সাধ না মিটিল, তুই নাকি মা দয়াময়ী, সকলই তোমারই ইচ্ছা, আমায় দে মা পাগল করে, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে—এই সব গানগুলো নিজের মনেই গুনগুন করতাম।

পরে জানলাম, উনি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাই। আরও পরে জানলাম, মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। যিনি এমন ভক্তিগীতি গাইতেন, তিনি নিজেকে এভাবে কেন শেষ করে দিলেন ? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। পরে নানা লোকের কাছে একটু একটু করে জেনেছি। আগে দুই ভাইই নাকি শ্যামাসঙ্গীত ও আধুনিক দুটোই গাইতেন। দাদা ধনঞ্জয়ের পরামর্শেই শ্যামাসঙ্গীতকেই বেছে নেন পান্নালাল। দুজনের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে গেল। ফিল্ম ছাড়া ধনঞ্জয় শ্যামাসঙ্গীত গাইবেন না। আর পান্নালাল আধুনিক গাইবেন না। এই বোঝাপড়াটা ঠিকঠাকই চলছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর স্নেহে কোনও কার্পণ্যও ছিল না।

কিন্তু একটু নাম-ডাক হলে যা হয়! অনেক রকম বন্ধু জুটে যায়। তাঁরাই কান ভাঙাতে লাগলেন পান্নালালের। বোঝানো হল, তিনি আধুনিক গান গাইলে ধনঞ্জয়ের বাজার থাকবে না। তাই তিনি ভাইকে সরিয়ে দিলেন। অনেকে বলেন, পান্নালাল নাকি সেই সময় এরকম প্রচারে বিশ্বাসও করেছিলেন। ফলে, দুই ভাইয়ের বাক্যালাপই বন্ধ হয়ে গেল। পরে সেই দূরত্ব কিছুটা কমলেও মাঝের সেই ফাটলটা থেকেই গিয়েছিল।

কিছুটা যেন হতাশই হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝেই শ্মশানে চলে যেতেন। নিজের মনেই বিড়বিড় করে কথা বলতেন। বলতেন, এত মা –এর গান গাইলাম, মা দেখা দিচ্ছে না কেন ? বাড়িতে তখন স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে। কিন্তু একটু একটু করে যেন সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ছেন। একদিন নিলেন সেই চরম সিদ্ধান্তটা। কাউকে কিছু না জানিয়েই চিরতরে হারিয়ে গেলেন চেনা জগৎ থেকে।

পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে গেল। অনেক সাধ হয়ত মেটেনি। অনেক আশা পূরণও হয়নি। কিন্তু সব কি ফুরিয়ে গেল ? এখনও প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে তাঁর গান ঠিক বেজে ওঠে। ফুরিয়ে যায়নি। সেই কণ্ঠ হয়ত অমরত্বই পেয়ে গেল।

বিতাড়িত ন্যানোর আত্মকথা

যত পাজি ওই বুদ্ধবাবু টাটাকে তাড়িয়েই ছাড়লেন!

স্বরূপ গোস্বামী

এটাই হয়। কাজের সময় কাজি। কাজ ফুরোলেই পাজি। একসময় আমাকে নিয়ে কত হইচই। আমাকে নিয়ে চ্যানেলে সারাক্ষণ আলোচনা। আমাকে নিয়ে কাগজের প্রথম পাতা। যেই সময়ের ধুলো পড়ল, অমনি সবাই বেমালুম ভুলে গেল। না বাম, না ডান, না রাম–কেউ আমার নামই উচ্চারণ করত না।

যাক, আবার আমি ফিরে এলাম। আপনারা যতই কুৎসা করুন, আমি বাপু দিদিমণির কাছে কৃতজ্ঞ। তিনিই তো আমাকে কবর থেকে তুলে আনলেন। তাই তো আপনারা আবার পুরনো খবরের কাগজের কাটিং খুঁজে বের করছেন। তাই তো আবার টিভির সান্ধ্য আসরে হইচই চলছে। তাই তো আবার ফেসবুকে চুকলি কাটা চলছে।

ফিরে চলুন, চোদ্দ–পনেরো বছর আগে। আমাকে নিয়ে, মানে ন্যানোকে নিয়ে রাজ্য তখন উত্তাল। একদিকে মহাকরণে তখন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বাংলার তরুণদের চোখে নতুন স্বপ্ন এঁকে দিচ্ছেন। জোর দিয়েছেন কর্ম সংস্থানে। এখান–ওখান ছুটে যাচ্ছেন। শিল্পপতিদের বোঝাচ্ছেন, বাংলায় বিনিয়োগ করুন। বারবার বলছেন, এত এত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এত এত আইটিআই কলেজ। এখান থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা যাবে কোথায়? তারা কেন ভিনরাজ্যে যাবে? এই রাজ্যেই তাদের কাজ দিতে হবে। কলকারখানা স্থাপন করতে হবে। শিল্পে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। কৃষি আমাদের ভিত্তি। শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। শিল্পের দিকে আমাদের এগোতেই হবে।

অন্যদিকে, কুচুটে বামপন্থীদের দল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো অনশনে বসে গেলেন। কিছুতেই তিনি জমি অধিগ্রহণ করতে দেবেন না। কিছুতেই তিনি কারখানা হতে দেবেন না। কেনারাম-বেচারামদের নিয়ে চলে গেলেন সিঙ্গুরে। মাচা করে বসলেন। হাইওয়ে দিনের পর দিন অবরোধ করে রাখলেন। কত নকশাল, মাওবাদি, হাফ নকশাল, কাকতাড়ুয়া শিল্পী জুটে গেল ওই বুদ্ধবাবুর সঙ্গে। তাঁরা বলেই চলেছেন, কোনও ভাবেই জমি নেওয়া চলবে না। কীসের অনুসারী শিল্প? ওখানে শিল্প হবে না ছাই হবে। সব টাটাকে জমি দেওয়ার ফন্দি। একটা কারখানা করতে কত জমি লাগে? আমাকে শিল্প শেখাতে আসবেন না। ওখানে শপিং মল হবে, পানশালা হবে, বিউটি পার্লার হবে, আরও কী সব যেন হবে। জমি নেওয়া চলবে না। জমি নিতে গেলে রক্তগঙ্গা বইবে। আমাদের দিদিমণি খুবই সহিষ্ণু। খুবই শান্তিপ্রিয়। তিনি বিরোধীদের মর্যাদা দেন। তাই বৈঠক ডাকলেন। একবার তথ্যকেন্দ্রে। একবার রাজভবনে। বুদ্ধবাবুকে বারবার তিনি বোঝালেন, আমাদের বিরুদ্ধে যত খুশি আন্দোলন করুন। কিন্তু প্লিজ, কারখানাটা হতে দিন। এত এত বেকার ছেলের কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করবেন না। এই কারখানা হলে এলাকার চেহারা পাল্টে যাবে। একটা কারখানা হলে তার হাত ধরে আরও কয়েকশো কারখানা তৈরি হবে। ইতিহাস এই সুযোগ বারবার দেয় না। প্লিজ, রাজি হয়ে যান।

কিন্তু গোঁয়ার বুদ্ধবাবু এসব শুনলে তো! প্রথম থেকেই গোঁ ধরে বসে আছেন, আমার চারশো একর চাই। ওই চারশো একর ছাড়া তিনি কিছুই বোঝেন না। আলোচনা হল, সব ভেস্তে

আনন্দবাজার পত্রিকা

ন্যানো নেই রাজ্যে

মমতার জন্যই সিঙ্গুর ছাড়লাম: রতন টাটা

গেল। তিনি কিছুতেই কারখানা হতে দেবেন না। শুধু কি বুদ্ধবাবু! বিমান বসু, নিরুপম সেন, গৌতম দেব— সবাই পাজি। তারা জেদ ধরেই রইল— কিছুতেই কারখানা হতে দেব না। অনিচ্ছুকদের জমি ফেরত দিতেই হবে। সিঙ্গুরে কেন কারখানা হবে? কত ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। সেখানে হোক। তাছাড়া, শিল্প করতে এত জমি কেন লাগবে? বুদ্ধবাবু সবাইকে লেলিয়ে দিলেন। সবাই মিলে কিনা বিধানসভা ভাঙচুর করলেন।

বেচারা রতন টাটা। কত আশা ছিল, ন্যানো গাড়ির কারখানা করবেন। মানুষকে একলাখ টাকায় গাড়ি দেবেন। অটো মোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে বিপ্লব আনবেন। দিদিমণির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। শিল্পকে নিয়ে দিদিমণির কত স্বপ্ন, কত আন্তরিকতা। টাটাবাবুরা বুঝেছিলেন।

কিন্তু ওই যে খুনি বুদ্ধবাবু। কুচুটে সিপিএম। তারা বুঝতেই চাইল না। তারা টাটাকে তাড়িয়েই ছাড়ল। রতন টাটা তো যাওয়ার সময় বলেই গেলেন, সিপিএমের জন্যই শিল্প করতে পারলাম না। তাদের জন্যই আমাকে এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও কারখানা করব। কিন্তু বুদ্ধবাবু তো ট্রিগার টিপে দিলেন।

দিদিমণি যথার্থই রাজ্যের ভাল চান। তাই বারবার বলেছেন, টাটার কারখানা না হওয়ায় কতবড় ক্ষতি হয়ে গেল, এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন না। রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। আগামীদিনে কেউ আসতে চাইবে না। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু-নিরুপম সেনরা বুঝলেনই না। টাটাকে তাড়িয়ে তাঁরা বিজয় উৎসব শুরু করে দিলেন। একেবারে আবির খেলা, মিষ্টি খাওয়ানো শুরু করে দিলেন।

মাত্র চোদ্দ বছরে সবাই কেমন বেমালুম ভুলে গেল। শুধু শুধুই দিদিমণিকে দায়ী করে। সত্যিই তো, তাঁর কোনও দোষই ছিল না। তিনি তো চেয়েছিলেন টাটার কারখানা হোক। যত পাজি ওই সিপিএম। তারাই টাটাকে তাড়িয়ে ছাড়ল।

কী বলছেন? আমি ভুল বকছি? আমি ইতিহাস বিকৃত করছি? আমি মিথ্যে বলছি? ধুর মশাই,

আপনারা কিছুই জানেন না। যান, আগে ‘নিরলস সাহিত্যসাধনা’ করে আসুন। ভুয়ো ডক্টরেট, ডিলিট এসব নিয়ে আসুন। রাজ্যে এত বিনিয়োগ হচ্ছে, এত কলকারখানা হচ্ছে, আপনারা বুঝতেও পারছেন না। প্রাইমারি, এসএসসি, সিএসসি-র মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে এত শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে, আপনারা জানতেও পারছেন না।

আসলে, আপনারা যেগুলো শুনে এসেছেন, দেখে এসেছেন, সেগুলোই গিলতে থাকেন। তলিয়ে ভাবতেই পারেন না। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা সভ্যতা কত বছর পর আবিস্কার হয়েছিল। ইতিহাস এভাবেই চাপা পড়ে থাকে। কতকাল পরে দিদিমণি সেই আড়ালে থাকা সত্যি আবিস্কার করলেন। রাখালদাসের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দিদিরও তাই। মনে রাখবেন, ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’দের একটা আলাদা প্রতিভা থাকে। সিঙ্গুরের ধ্বংসাবশেষ দেখে, শিল্পের ডিএনএ টেস্ট করে আসল সত্যিটা তিনি ঠিক বের করে এনেছেন। এর জন্য পোতিভা লাগে মশাই, পোতিভা।

আপনি কি ভাবছেন আমি বিভূতিভূষণ, মানিক বা তারাশঙ্কর— এই তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি? বা, তারও আগে বিদ্যাসাগর উপাধি পাওয়া বাঁড়ুজ্যের কথা বলছি? ওঁরা বাংলার জন্য কী করেছেন? ভুলেও ওঁদের ‘বাংলার গর্ব’ বলতে যাবেন না। ‘বাংলার গর্ব’ একজনই। এই কৃতিত্বের কোনও ভাগ হবে না।

আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। তিনি বলে দিয়েছে, আর কোনও কথা হবে না। আমি তো রাজ্যছাড়া হয়েছি, আপনারাও কি হতে চান? তার থেকে বরং আপনারাও ‘অনুপ্রাণিত’ হোন। মেনে নিন, টাটাকে সিপিএমই তাড়িয়েছে।

রাজনীতি

রাবার স্ট্যাম্প কি শুধুই খাড়্গে?

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে হতে চলেছেন? এটা নিয়ে কোনও মহলেই তেমন কোনও সংশয় ছিল না। নির্বাচনের আবহ তৈরির পরই দেওয়াল লিখনটা স্পষ্টই ছিল। যত দিন গেছে, তা স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্টতর হয়েছে। কারণটাও সহজবোধ্য। কদিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল, দশ জনপথের অলিখিত সমর্থন মল্লিকার্জুন খাড়্গের দিকেই। শশী থারুর দাঁড়িয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তিনি থাকবেন নিষ্ফলের, হতাশের দলে। অবশ্য শশী নিজেও কি আশা করেছিলেন তিনি জিতবেন? স্মার্ট শশী এতখানি আনস্মার্ট নিশ্চয় নন।

খাড়্গে যে প্রথম পছন্দ ছিলেন, এমনটা বলা যাবে না। শুরুর দিকে অশোক গেহলটকেই সভাপতি হিসেবে ভাবা হয়েছি। তিনি দীর্ঘদিনের প্রবীণ রাজনীতিক। দশকের পর দশক ধরে গান্ধী পরিবারের একান্ত অনুগত। কিন্তু মুশকিলটা হল, তিনি ধরেই নিলেন কংগ্রেস সভাপতি হলে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হবে। অনুগত কাউকে বসাতে পারলে হয়ত মেনেও নিতেন। কিন্তু তিনি ছাড়লেই সেই কুর্সিতে বসবেন শচীন পাইলট। তাহলে রাজস্থানের রাজনীতিতে তাঁর আর কোনও কর্তৃত্ব থাকবে না। এটা বুঝে নিজের অনুগতদের লেলিয়ে দিলেন শচীনের বিরুদ্ধে। ফল যা হওয়ার, তাই হল। সোনিয়া গান্ধী ঠিক করেই ফেললেন, এমন লোককে জাতীয় সভাপতি করা যায় না। তখন দৌড়ে দ্বিতীয় নাম খাড়্গে।

তিনিও অনুগত। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি। তাঁর জন্য কখনই অস্বস্তিতে পড়তে হবে না। লোকসভায় তিনিই ছিলেন দলনেতা। লোকসভায় হেরে যাওয়ার পর তাঁকে আনা হল রাজ্যসভায়। সেখানেও এই দক্ষিণী পিছড়ে বর্গের নেতাকেই দলনেতা করা হয়েছে।

গান্ধী পরিবারের সুবিধাটা কোথায়? এতদিন বারবার এটাই অভিযোগ উঠত, তাঁরা ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন। ফলে, ব্যর্থতার সব দায় তাঁদেরই নিতে হত। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির আক্রমণের নিশানাই থাকতেন রাহুল

গান্ধী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই পরিবারতন্ত্রের কথা টেনে আনা হত। নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে গিয়ে এমনকী বারবার নেহরুকেও টেনে আনতেন প্রধানমন্ত্রী। রাহুলের দোষ চাপাতেন নেহরুর ঘাড়ে। আর নেহরুকে আক্রমণ করে সেই দায় চাপাতেন রাহুলের ঘাড়ে। এবার সেই অস্ত্রটা কিছুটা ভোঁতা হয়ে গেল। কথায় কথায় আর গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ শানাতে পারবেন না। রাহুলও বলতে পারবেন, তিনি আর নিয়ন্ত্রণ করছেন না। নির্বাচিত সভাপতিই দল চালাচ্ছেন। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, আমি সেটাই পালন করব। আবার যেদিন রাহুলের সভাপতি হতে ইচ্ছে হবে, একবার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেই হবে। ভরত যেভাবে রামের পাদুকা সিংহাসনের রেখে রাজ্য চালাতেন, খাড়্গেও অনেকটা সেভাবেই কংগ্রেস চালাবেন।

নির্বাচনের আগে থেকেই জোরাল প্রচার, তিনি গান্ধী পরিবারের রাবার স্ট্যাম্প হতে চলেছেন। কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সোনিয়া বা রাহুল কংগ্রেস সভাপতি হতে চাইলেন না। তাই বলে কংগ্রেসের রাশ তাঁদের হাতে থাকবে না, এমনটা যাঁরা আশা করেন, তাঁরা কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিবহাল! কংগ্রেসের যেটা সবথেকে বড় বোঝা, সেটাই আবার সবথেকে বড় সম্পদ। গান্ধী পরিবারের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই কংগ্রেস এখনও অনেকটাই ঐক্যবদ্ধ আছে। নইলে, আরও অরাজকতা তৈরি হবে। কেউ কাউকে মানবেন না। কেউ কারও কথাই শুনবেন না। নরসীমা রাও বা সীতারাম কেশরির সময়ে কংগ্রেসের ডামাডোলের কথা মনে নেই? নরসীমা একদিকে প্রধানমন্ত্রী, অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি। তারপরেও কখনও শরদ পাওয়ার, কখনও অর্জুন সিং, কখনও রাজেশ পাইলট রোজ কোথাও না কোথাও বিদ্রোহ

করেই চলেছেন। এখন তো ক্ষমতায় নেই। ফলে, নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব মানার প্রশ্নই নেই। তবু দশ জনপথ পাশে থাকলে রাজ্য স্তরের নেতারা একটু সমীহ করবেন। নইলে সেটুকুও থাকবে না।

তাই যদি রাবার স্ট্যাম্প হয়ে থাকতেই হয়, সেটা খাড়্গের পক্ষেই সুবিধা। কারণ, তাঁর না আছে বিরাট জনভিত্তি, না আছে বিরাট বাগ্মীতা। না আছে প্রবল উচ্চাকাঙ্খা। ফলে, তাঁকে ছায়া হয়েই থাকতে হবে। শাসক দল থেকে কটাক্ষ আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাবার স্ট্যাম্প প্রথা কি বিজেপিতে নেই? বরং একটু বেশিই আছে। ধরা যাক, এখন জাতীয় সভাপতির নাম জেপি নাড্ডা। প্রশাসনিক বিষয় তো ছেড়েই দিন, সাংগঠনিক কোনও ছোটখাটো বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাঁর কোনও এক্তিয়ার আছে? তাঁকে পদে পদে নরেন্দ্র মোদির মর্জি বুঝেই চলতে হয়। এমনকী সিকিম বা মণিপুরের মতো ছোট রাজ্যেও কারা সভাপতি হবেন বা কারা লোকসভার টিকিট পাবেন, সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার তিনি কেউ নন।

শুধু সাংগঠনিক সভাপতি কেন, একেবারে দেশের রাষ্ট্রপতির কথায় আসুন। কে মনোনয়ন পেতে পারেন, আগেরবার কেউ ঘুণাক্ষরে টের পেয়েছিলেন? বিজেপি নেতারাও টিভিতেই প্রথম রামনাথ কোবিন্দের নাম শুনেছিলেন। ক্যাবিনেট বলুন বা কার্যকরী সমিতি, সবাই ছিলেন অন্ধকারে। এবার দ্রৌপদী মুর্মুর নামটা একটু আগে ভেসে উঠলেও এই সিদ্ধান্তের পেছনে দলের সাংসদদের বা মন্ত্রীদের কোনও ভূমিকা ছিল? কোন স্তরে আলোচনা বা মতামত নেওয়া হয়েছে? কোথাও ভিন্নমতের ন্যূনতম পরিসর ছিল? মোদ্দা কথা, একজন যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। আর রাষ্ট্রপতি যে কতটা জোহুজুর হতে পারেন, তা রামনাথ কোবিন্দ নিজেও বেশ কয়েকবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ার সময়টার কথা মনে করুন। হঠাৎ, রাত দুটোর সময় রাষ্ট্রপতি শাসন উঠে গেল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভোর ছটায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ হয়ে গেল। ভারতের রাজনীতিতে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে? রাষ্ট্রপতিকে অনেক সময়ই সরকারের মর্জিমাফিক চলতে হয়। সেটা অনেকটা সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাও। কিন্তু তাই বলে রাত আড়াইটেয় বিজ্ঞপ্তি জারি আর সকাল ছটায় শপথ! রাষ্ট্রপতি পদের গরিমাকে এতখানি হাস্যকর আর কেউ করেছিলেন! কারও নির্দেশ ছাড়াই এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে?

মোদ্দা কথাটা হল, খাড়্গেকে রাবার স্ট্যাম্প হয়েই থাকতে হবে। যেমনভাবে রাষ্ট্রপতিকে বা বিজেপি সভাপতিকেও রাবার স্ট্যাম্প হয়ে থাকতে হয়।

কৌশিক সেনের নাম কেন যে বারবার টেনে আনা হয়!

রক্তিম মিত্র

কোনও একটা অপকর্ম হলেই হল। কেউ কেউ অমনি প্রশ্ন তুলে দেন, বুদ্ধিজীবীরা কোথায় গেলেন? কারও কারও একেবারে স্পেসিফিক প্রশ্ন, কোথায় গেলেন অপর্ণা সেন, কৌশিক সেনরা?

বারবার এই দুটো নাম কেন যে উঠে আসে, বুঝি না। এই বাংলায় সরকারে দাক্ষিণ্যভোগী, নির্লজ্জ তোষামোদকারী বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। চাইলে, এমন পঁচিশ–তিরিশটা নাম করাই যায়। কিন্তু কেন বারবার অপর্ণা সেন আর কৌশিক সেনের নামটা ভেসে ওঠে? যাঁরা এই দু'জনের নাম টেনে আনেন, তাঁরা সচেতনভাবেই আনেন? নাকি এই দুটো নামই প্রথমে মনে পড়ে যায়!

হ্যাঁ, সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম পর্বে প্রতিবাদের অন্যতম মুখ ছিলেন কৌশিক সেন। বিভিন্ন সভাসমিতিতে, টিভির বিতর্কসভায় তাঁরা বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এমনকী পরিবর্তন চাই বলে আওয়াজও তুলেছিলেন।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর অনেকেই বিধায়ক, সাংসদ হয়ে গেলেন। অনেকেই অনেক কমিটির মাথা হয়ে বসে গেলেন। দলীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ আলো করলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বরাত পেলেন। সেই তালিকায় কি আদৌ রাখা যায় অপর্ণা সেন বা কৌশিক সেনকে? মনে করে দেখুন তো, গত দশ বছরে তৃণমূলের কোন মঞ্চে তাঁদের দেখেছেন? মনে করে দেখুন তো, তাঁদের কোন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে? মনে করে দেখুন তো, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দন্ত বিগলিত করে তাঁরা কোনওদিন ছবি তুলেছেন কিনা। মনে করে দেখুন তো, তৃণমূলের হয়ে কোথাও নির্বাচনী প্রচার করেছেন কিনা।

শাসকের কোন অন্যায়টাকে জাস্টিফাই করার জন্য তাঁরা মিছিলে হেঁটেছেন?

বরং উল্টোটা বারবার হয়েছে। কৌশিক সেনকে বছরের পর বছর অ্যাকাডেমি দেওয়া হয়নি। শনি–রবিবার কোনও নাটকের শো দেওয়া হয়নি। কোনও সরকারি বা আধা সরকারি কল শো–তে তাঁদের ডাকা হয়নি। বাধ্য হয়ে অ্যাকাডেমি ছেড়ে অন্য মঞ্চ খুঁজে নিতে হয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি অপকর্মেই সোচ্চার হয়েছেন। সাধ্যমতো প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন।

কিন্তু তারপরেও আক্রমণ থেমে নেই। কিছু হলেই তাঁদের কাঠগড়ায় তোলা হয়। 'চটিতচাটা', 'তৃণমূলের দালাল' এইসব আখ্যানে ভূষিত করা হয়। কোনও প্রতিবাদ মঞ্চে গেলে প্রশ্ন তোলা হয়, এতদিন পর মনে পড়ল! তারপর যা যা বিশেষণ ভেসে আসার, তাই আসে।

দিনদিন এই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর সত্যিই আস্থা হারিয়ে ফেলছি। হ্যাঁ, এই মিডিয়ার শক্তি অপরিসীম। এই মিডিয়ায় অনেক মানুষ গর্জে ওঠেন। মূলস্রোত মিডিয়ায় আড়ালে থাকা অনেক বিষয় উঠে আসে। কিন্তু পাশাপাশি এর অসহিষ্ণুতার দিকটাও মারাত্মক। অনেক সময় যেন ইতরতার উদযাপন চলে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, আক্রমণ করা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী সেই তালিকায় যখন বাম বন্ধুদেরও দেখি, তখন একটু বেশিই খারাপ লাগে। তাঁদেরও অসহিষ্ণুতার মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে।

তাই এত এত লোক থাকতে বেছে নেওয়া হয় কৌশিক সেনকে। যে কৌশিক সেন গত দশবছরে তাঁর মতো করে লড়ে চলেছেন। যে কৌশিক সেন শাসকের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেননি। যে কৌশিক সেন শাসকের দাক্ষিণ্যের পরোয়া করেননি। যে কৌশিক সেন পেশাগত এত ক্ষতিস্বীকার করেও তাঁর মতো করে প্রতিবাদ করে চলেছেন। সেই প্রতিবাদকে সম্মান জানানো তো দূরে থাক, প্রতিনিয়ত ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। কিছু লোক আছেন, গালাগাল দেওয়াটাই যাঁদের কাজ। কিন্তু বাকিরা না বুঝেই তাতে সামিল হয়ে যাচ্ছেন। তখন সেই গালাগালটাই মূলস্রোত হয়ে পড়ছে।

এই লোকেরা কি দলের সম্পদ হতে পারে! এই লোকেরা কি শাসকের হাতকেই আরও শক্তিশালী করছেন না? এটাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ছেলেবেলার চকোলেট বোম আর সেই রূপকথার ‘বুড়িমা’

আমাদের অনেকের ছোটবেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নাম বুড়িমার চকলেট বোম। কে ছিলেন এই ‘বুড়িমা’। কীভাবে গড়ে উঠল তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য? লড়াকু সেই বুড়িমার জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তুলে ধরলেন সংহিতা বারুই।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি বুড়িমার কথা। বাড়ির লোকের কাছে জানতে চাইতাম, কে এই বুড়িমা ? তিনি কোথায় থাকেন? কোনও উত্তর পেতাম না। পুজো এলে প্রশ্নটা ফিরে ফিরে আসত। পুজো পেরিয়ে গেলে প্রশ্নটাও থেমে যেত। আবার পুজো আসত। আবার ভেসে উঠত প্রশ্নটা। এভাবেই আমাদের অনেকের বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ‘বুড়িমার চকলেট বোম’।

বড় হলাম। কিন্তু ছেলেবেলার সেই প্রশ্নটা মাথায় থেকেই গিয়েছিল। কে এই ‘বুড়িমা’? তিনি কোথায় থাকেন? খোঁজ করতে করতে চলেই গেলাম। জানলাম, এক লড়াকু মহিলার দুরন্ত লড়াইয়ের উপাখ্যান। নিছক গল্প বলা ঠাকুমা নন। তাঁর লড়াই অনেকটা রূপকথার মতোই। পুজোর আবহে প্রিয় পাঠকদের কাছে তুলে ধরা যাক সেই লড়াইয়ের উপাখ্যান।

তার আগে বুড়িমার আসল নামটা বলে ফেলা যাক। তাঁর আসল নাম অন্নপূর্ণা দাস। জন্ম, বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতার যে কঠিন লড়াই, তা খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ফরিদপুর থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের ধলদিঘি সরকারি ক্যাম্পে ছিন্ন মূল হয়ে আসা। তারপর ধলদীঘি থেকে হাওড়ার বেলুড়ে আসা। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা ,অনেক হাহাকার

সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তবু তিনি সাধারণ বাঙালি নারী হয়েও ব্যবসা ক্ষেত্রে একা সাফল্যের ধ্বজা তুলে ধরে-ছিলেন। অন্নপূর্ণা দাস থেকে পরিণত হলেন অবশেষে বুড়িমা তে ।

সালটা ১৯৪৭। ভারতের স্বাধীনতার বছর। কিন্তু এখন যেটা বাংলাদেশ, তখনকার পূর্ব পাকিস্তান, সেখানের অবস্থা নারকীয়। লুঠতরাজ, হত্যা, ধর্ষণে জর্জরিত। সেই সঙ্গে চলছে জবর দখল। দলে দলে মানুষ তখন ভারত-মুখী। চার সন্তানের জননী অন্নপূর্ণা এই পরিস্থিতিতে দিশেহারা। তিন মেয়ে এক ছেলে। বড় আর মেজ মেয়ের সদ্য বিয়ে হয়েছে। ছোটো ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে যে এপার বাংলায় চলে আসবেন, সে উপায়ও নেই। স্বামী সুরেন্দ্রনাথের তেমন সায় ছিল না। তাঁর ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণাও। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ নাগাদ আশপাশের আর দশটা পরিবারের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসালেন অন্নপূর্ণাও।

ভারত অভিমুখে যাত্রা। পশ্চিম দিনাজ পুরের ধলগিরি ক্যাম্প। সঙ্গে ছোট ছোট দুই ছেলেমেয়ে। সুখের সংসার থেকে একেবারে রিফিউজি ক্যাম্পে। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। রোজ ভোরে উঠে সন্তানদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম। কোনও দিন পটল, বেগুন, কুমড়ো , ঝিঙে কিনে বাজারে বিক্রি করা। কখনও বা কর্মকারের কাছ থেকে হাতা, খুন্তি কিনে হাটে বিক্রি

কিংবা বাড়ি বাড়ি নানান সামগ্রী ফেরি। এই ভাবেই চলছিল। গঙ্গারামপুরে এভাবেই একদিন পরিচয় হয়ে গেল সনাতন মণ্ডলের সঙ্গে। তাঁর মুদির দোকান তো ছিলই, তার সঙ্গে তিনি দক্ষ হাতে বিড়িও বাঁধতে পারতেন। অন্নপূর্ণা দেবীকে তিনি মা বলে সম্বোধন করেছিলেন নিজের হারানো মা কে ভুলতে। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠার পর অন্নপূর্ণা দেবী সনাতনের কাছে জানতে চাইলেন বিড়ি বাঁধার কায়দা। মাতৃসমা অন্নপূর্ণা দেবীকে খুব যত্ন করেই বিড়ি বাঁধা শেখালেন সনাতন। ক্রমে ক্রমে অন্নপূর্ণাও হয়ে উঠলেন বিড়ি বাঁধায় দক্ষ। শুধু তাই নয়, বছর তিনেক ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি খুলে ফেললেন একটা বিড়ি তৈরির কারখানা। সেই সঙ্গে গড়ে উঠল একটা নিজের পাকা বাসস্থানও।

তবে সমস্ত সুখ একসঙ্গে হয় না। তাই তালেগোলে একমাত্র ছেলের লেখাপড়া শিকেয় উঠল। তার সঙ্গে আরও একটা বিপর্যয়। অন্নপূর্ণার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল সনাতনের ব্যবসা। তিনি গঙ্গারামপুর থেকে চাটিবাটি গুটিয়ে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়িতে। যাওয়ার আগে তিনি অন্নপূর্ণাদেবীর ছোট মেয়ের জন্য একটা পাত্রও ঠিক করে দিয়ে গেলেন। পাত্র বেলুড়ের। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে জামাই বেলুড়ের প্যারীমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে একটা দোকান-সহ বাড়ির সন্ধান দিলেন। দাম মাত্র ন'শো টাকা। আস্তে আস্তে অন্নপূর্ণা দেবী পরিচিত হলেন কলকাতার ব্যাপারী জগতের পীঠস্থান বড়বাজারে সঙ্গে। বিড়ির সঙ্গে চলতে লাগল নানা ধরনের ছোটখাটো জিনিসের ব্যবসা। এখানেও সনাতনের মতো পেয়ে গেলেন হরকুসুম গাঙ্গুলিকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ায় তাঁকে সনাতনের মতো সহজে ছেলে বলে মেনে নিতে দ্বিধায় ছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। তবে বিভেদ ঘুচিয়ে দিলেন হরকুসুমই। একদিন অন্নপূর্ণা দেবীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে স্বীকার করিয়ে নিলেন ছেলে হিসেবে। এঁর কাছ থেকেও অন্নপূর্ণা দেবী শিখে নিলেন আলতা, সিঁদুর বানানোর কৌশল। কুশলী অন্নপূর্ণা কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন আলতা -সিঁদুরে।

আসলে অন্নপূর্ণা দেবী যে ব্যবসাই করুন না কেন, তিনি সেটা করতেন বেশ যত্ন নিয়ে। তাই কৃত কর্মের ফল পেতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হত না। তিনি নানান মরশুমে মরশুমের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ঘুড়ির সময় ঘুড়ি, দোলের সময় রঙ, স্বরস্বতী পুজোর সময়

ঠাকুর, এমনকী কালী পুজোর সময় অন্যের থেকে কিনে এনে বাজিও বিক্রি করতেন ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনার জন্য। এমনি করেই এসে গেল পরের পুজো। বাজি বিক্রি করতে করতে আবিষ্কার করলেন কমবয়সীরা তাঁকে বুড়িমা বলে সম্বোধন করছে। দিনের শেষে অবাক অন্নপূর্ণা। নিজেকে আয়নায় দেখে আবিষ্কার করলেন জীবনের নানান ওঠা পড়ার মাঝে কখন যেন তাঁর মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি হয়ে গিয়েছেন 'বুড়িমা'। তা বুড়ির দমে যাওয়ার বদলে এল নতুন উদ্যম। হোক না সাদা চুল। কুছ পরোয়া নেই। আরও বেশি বেশি করে বাজি কিনে এনে দোকান ভরানোর উৎসাহ এসে গেল তাঁর মাথায়। কিন্তু টাকা কোথায়? অগত্যা হা পিত্যেশ করে বসে বসে ভাবনা। ভাবনার কারণ জানতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন নমিতা দেবী। একহাজার টাকা ধার নিয়ে বড়বাজার থেকে বাজি এনে ভরিয়ে তুললেন দোকান বুড়িমা। এটা দেখি, বুড়িমা ওটা দেখি, কচিকাচাদের কিচিরমিচিরে মন ভরে গেল অন্নপূর্ণার। কিন্তু এবারে বিধি বাম। পুলিশ এসে জানতে চাইল বাজি বিক্রির সরকারি ছাড়পত্র তাঁর কাছে আছে কি না। তা না থাকায় সমস্ত বাজি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে চলে গেল তারা।

সারা জীবন ধরে সংগ্রামী জীবন–যাপন করা বুড়িমা অত সহজে দমে যাওয়ার পাত্রী নন। তাঁরও জেদ চেপে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শুধু বাজি বিক্রিই নয়, বাজি তৈরিও করবেন। আর তার জন্য যাবতীয় ছাড়পত্র তিনি জোগাড় করে ফেললেন। ছেলে তো মায়ের কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক। কিন্তু বুড়িমা এক মরশুমেই বাজি তৈরির কাঁচামাল, তা বানানোর পদ্ধতি প্রভৃতি জানার জন্য হাওড়ার বাঁকরা, বজবজের নুঙ্গি চষে ফেললেন। যখনই তিনি নতুন নতুন ব্যবসায় হাত দিয়েছেন, তখনই তাঁর সামনে দেবদূতের মতো হাজির হয়েছেন কখনও সনাতন, কখনও হরকুসুম , কখনও বা নমিতা । এবারেও বাজি বিশারদ আকবর আলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। নিজের হাতে শিখে

নিলেন বাজি তৈরির হরেকরকম পন্থা। তারপরই তাঁর এক মাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল বাজি তৈরি।

কিন্তু সেই বাজির তো কিছু একটা নাম রাখতে হবে। নিজের পরিচয়েই তৈরি হল বাজির ব্র্যান্ড। নাম দেওয়া হল ‘বুড়িমা’। ওই নামেই তিনি কচিকাচা-দের কাছে পরিচিত। সেই থেকেই শুরু হল ‘বুড়িমা’র জয়যাত্রা। একে একে তিনি রপ্ত হতে থাকলেন সোরা, গন্ধক, বারুদের বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণ ছেকে কীভাবে নানা রকমের বাজি তৈরি করা যায়। তবে হরেক কিসিমের বাজি বানালেও রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন যেটা বানিয়ে, তা হল বুড়িমার চকলেট বোম। টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাওড়া থেকে বারাসত সব জায়গাতেই বিখ্যাত হয়ে উঠল এই নাম। এক মরশুম থেকে আর এক মরশুমের মাঝে ব্যবসাকে কী করে আরও বাড়ানো যায় সেই চিন্তাতেই কাটত বুড়িমার দিন।

এর ফাঁকেই তিনি তালবান্দা আর ডানকুনিতে তৈরি করে ফেললেন আরও দুটো কারখানা । ছেলে সুধীর-নাথকে কুঁড়েমি কাটানোর জন্য রবার

ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। এবার ওই কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বসালেন কারখানায়। নিজে আরও বড়, আরও বড় কারখানা, আরও বড় ব্রাণ্ডিং – এর প্রয়োজনে পাড়ি দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত বাজি শহর শিবকাশীতে। সেখানেই লিজে জমি নিয়ে একটা কারখানা গড়ে তৈরি শুরু করলেন দেশলাই। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এবার বুড়িমার নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ইতি মধ্যে সুরদের কাছ থেকে পিয়ারি মোহন স্ট্রিটে জোগাড় করলেন আরও জমি। এখানে নিজেদের আবাসস্থল তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুললেন একটা বড় গুদামঘরও। ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, বুড়িমা ১৯৯৫ সালে দেহত্যাগ করার পরই ১৯৯৬ সাল থেকে কিছু বছর শব্দবাজি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও ইতি মধ্যে শব্দ বাজির ঊর্ধ্বসীমা ৯০ ডেসিবেলের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওই শব্দ মাত্রার ওপরের বাজি ওখানে বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। বাজি ফাটানো যাবে কিনা, তা নিয়ে মাঝে মাঝেই আদালতে মামলা হয়। জল গড়ায় হাইকোর্ট, এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও। কিন্তু বাজিকে ঘিরে নস্টালজিয়া। সেখানে তো আর কোর্টের হাত নেই। শুধু চকলেট বোম নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরও নানা ধরনের বাজিরই বিপণন এখনও হয়ে চলেছে। আর তা করে চলেছেন তাঁর দুই সুযোগ্য নাতি সুমন আর রমেন দাস। তাঁরা জানালেন, বিনা শব্দের বাজির মধ্যে তাঁরা এনেছেন বিভিন্ন বৈচিত্র্য। এসব প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে একেবারে নতুন প্রজন্মের মানুষ সুমন দাসের ছেলে সদ্য এম বি এ পাশ করা সুমিত দাসের নেতৃত্বে। না থেকেও আছেন বুড়িমা। আছে দুরন্ত সেই লড়াইয়ের রূপকথা।

স্পেশ্যাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস মানেই আকর্ষণীয় স্পেশ্যাল ফিচার। দৈনন্দিন খবরের ভিড়ে একটু অন্যরকম স্বাদ। চাইলে আপনিও সময়োপযোগী ফিচার পাঠাতে পারেন।

❑ শব্দসংখ্যা: ৫০০ থেকে ৮০০।

❑ পিডিএফ নয়, লেখা পাঠান ইউনিকোডে।

❑ লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

ফিরে দেখা

আশির দশক

কিশোর মনে ঝড় তোলা সেই ‘শত্রু’

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ আশির দশক। উঠে এল তখনকার একটি হিট ছবির কথা। সেই ছবিকে ঘিরে অনেক নস্টালজিয়ার কথা। শিশুমনে কত প্রশ্ন ও মুগ্ধতার কথা। লিখেছেন সুমিত চক্রবর্তী।।

কোন ছবির কে পরিচালক, কে চিত্রনাট্যকার, এসব বোঝার মতো বয়স তখন হয়নি। সদ্য বেড়ে ওঠা। শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরেও তখনও আসিনি। তখন যে নায়ক, তারই সিনেমা। আড়াল থেকে কে গাইছে, জানার দরকার নেই। সিনেমায় যাকে দেখাচ্ছে, এটা তারই গান। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। কোন সিনেমার কী বার্তা, কোন দৃশ্য কতটা রোমান্টিক, এসব বুঝতে বয়েই গেছে। যে সিনেমায় যত মারপিট, সেই সিনেমা তত ভাল।

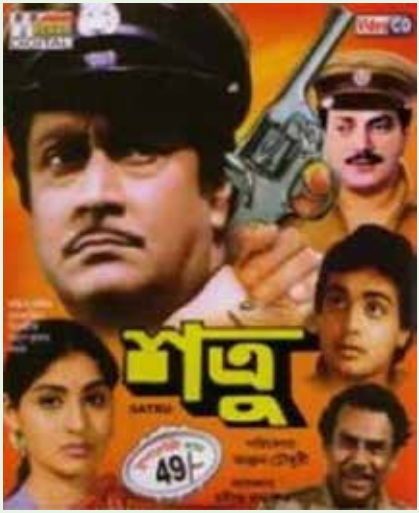

আশির দশক। মফসসলে তখনও হিন্দি সেভাবে জাঁকিয়ে বসেনি। এমনকী ভিডিও হল সংস্কৃতিও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সিনেমা বলতে শহরের সিনেমা হল। আর স্কুলে তিন চারদিনের পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো। সে অর্থে বলতে গেলে, আমার মনে প্রথম দাগ কাটা ছবি শত্রু। তখন কে অঞ্জন চৌধুরি, চিনতাম না। আমার কাছে শত্রু মানে রঞ্জিত মল্লিক। এক সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসার। সেই ছবিতে চিরঞ্জিৎ ছিলেন, প্রসেনজিৎও ছিলেন। কিন্তু আমার মনজুড়ে একজনই রঞ্জিত মল্লিক। সেই ছবিটা দেখেই পুলিশকে সম্মান করতে শিখেছিলাম। দৈনন্দিন নানা ঘটনায় পুলিশ সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়। তবু এখনও যে বিশ্বাসটা তলিয়ে যায়নি, তার একটা বড় কারণ শত্রু। মনে হয়, শুভঙ্কর সান্যালের মতো দারগা হয়ত এখনও আছেন।

তখন থেকেই রঞ্জিত মল্লিক আমার প্রিয় নায়ক। এই হ্যাংওভারটা তার পরেও আরও বছর পনেরো ছিল। রঞ্জিত মল্লিকের প্রায় সব ছবিই দেখেছি। মনে হত, এই লোকটা খারাপ হতে পারে না। একজন আদর্শবান লোক বললেই এই মুখটা ভেসে উঠত।

মনে রাখার মতো সব সংলাপ। হাততালি দিতাম। তখন মনে হত, এগুলো রঞ্জিত মল্লিকই বলছেন। পরে বুঝলাম, ওই সংলাপগুলো অঞ্জন চৌধুরির লেখা। ওই ছবিতে প্রসেনজিৎ ছিল গুন্ডা টাইপের। তাই পরে প্রসেনজিতের যত ভাল ছবিই দেখি, ওই ছবি একটা অন্যরকম ধারনা গড়ে দিয়েছিল। মনে হত, এই লোকটা খুব খারাপ। ছবিতে চিরঞ্জিৎও ছিলেন সৎ পুলিশের ভূমিকায়। হয়ত তাই তাঁর প্রতিও একটা আলাদা দুর্বলতা রয়ে গেছে।

মহুয়া রায়চৌধুরি। আশির দশকে আমার আরেক প্রিয় চরিত্র। কী মিষ্টি মুখটা! খুব কাছের মনে হত। হঠাৎ শুনলাম, আগুনে পুড়ে তাঁর নাকি মৃত্যু হয়েছে। সেটা কি চলে যাওয়ার বয়স ছিল! আশির দশকে মন ভারাক্রান্ত করার মতোই একটা ঘটনা। ছবির কথায় ফিরি। মন কেমন করে দেওয়া একটা গান ছিল— বল না গো, কার মা তুমি/ কোথায় তোমার ছেলে। গানটা পরে অনেকবার শুনেছি। যতবার শুনেছি, চোখ ছলছল করে উঠেছে। ছোট্টু নামে একটা ছেলের লিপে গানটা ছিল। আমি জানতাম, এটা ছোট্টুরই গান। বলতাম, ছেলেটা কী ভাল গান গায়! পরে জানলাম, ওটা নাকি আরতি মুখার্জির গান। ছেলের গলায় মেয়ের গান! এমন কত বিস্ময় যে তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, সেই ছোট্টু। আসল নাম মাস্টার তাপু। আরও দু একটা ছবিতে টুকটাক কাজ করেছে। তারপর ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে গেল! কেউ কি সন্ধান দিতে পারেন!

(বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— ফিরে দেখা। ফেলে আসা সময়ের নানা ঘটনা, নানা অনুভূতি ও চরিত্র উঠে আসতে পারে এই ফিচারে। এবার উঠে এল আশির দশকের একটি জনপ্রিয় সিনেমা ও তাকে ঘিরে তখনকার ভাবনার কথা। এমন নানা বিষয় নিয়ে আপনিও লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

ফিরে দেখা

আশির দশক

টিভিতে দেখা, স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যা

ময়ূখ নস্কর

সরোবরের জলে সাঁতার কাটছে একটি রাজহংসী। হঠাৎ সে গলা বাঁকিয়ে দিকবদল করল। শব্দ হল না। ঢেউ উঠল না। একটা পালকও বাঁকল না। শুধু জলের ওপরে কয়েকটা রেখা আঁকা হয়ে গেল। দেখেছেন এমন দৃশ্য? দেখে কী মনে হয়েছে? সরস্বতী ঠাকুরের কথা? দূর মশাই, তাহলে আপনি আশির দশকে কৈশোর কাটাননি।

এখন আপনার বয়স কত? চল্লিশ পেরিয়েছে? আকাশে লঘুভার সাদা মেঘ দেখে আপনার কী মনে হয়? কী মনে হয় এলোমেলো হাওয়ায় কাশফুলের ওড়াউড়ি দেখে? শরৎকাল, দুর্গাপুজো? দূর, তাহলে আপনি স্টেফি গ্রাফ বলে কাউকে দেখেননি। দেখেননি তাঁর সাদা স্কার্টের ছন্দময় ওড়াউড়ি।

আটের দশক। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে টিভি। সাদা কালো, তবু তার দৌলতেই বাইরের পৃথিবী উকিঝুকি মারছে বাঙালির ঘরে। পা রাখছে টেনিস নামক এক ভিনদেশি খেলা। বিটকেল তার নিয়ম কানুন। পনেরোর পরে তিরিশ, তারপরেই চল্লিশ। ডিউজ, অ্যাডভান্টেজ, ডাবল ফল্ট, আনফোর্সড এরর– বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

তবুও এই না বোঝার মধ্যেই জার্মানি থেকে উঠে এল দুটি ছেলে-মেয়ে। একজন ফুটবলের গোলকিপারের মতো ড্রাইভ দেয়–সদ্য কৈশোর ছাড়ানো বরিস বেকার। আরেকজন স্টেফি গ্রাফ। তাঁর টিকালো নাক, তাঁর পনিটেল, সে জিতলেও কাঁদে, হারলেও কাঁদে। সেই প্রথম জানলাম, আনন্দেও কাঁদা যায়।

জার্মানি বললাম বটে। কিন্তু আসলে পশ্চিম জার্মানি। পৃথিবীর মানচিত্র তখন অন্যরকম

ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজে জ্বলছে। জার্মানির পূর্বে সমাজতন্ত্র, পশ্চিমে ধনতন্ত্র। মাঝে বিশাল এক পাঁচিল। ভারতীয়রা মনেপ্রাণে জানে, সোভিয়েত আমাদের বন্ধু। বাংলা তখন লালে লাল।

কিন্তু কী বিস্ময়, কী বিস্ময়। ধনতন্ত্রী পশ্চিম জার্মানির এক মেয়ের জন্য আকুল হল আমার সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকা মন। চেকোস্লাভাকিয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, যুগোস্লাভিয়ার মনিকা সেলেস–কমিউনিস্ট দেশ থেকে উঠে আসা দুই মেয়ের বদলে সমর্থন করলাম হিটলারের দেশের মেয়েকে। প্রেম আর কবে তত্ত্বকথা মানে!

হ্যাঁ, প্রেম। কৈশোরের প্রেম। ইংরেজিতে যাঁরে বলে ইনফ্যাচুয়েশন। কে শ্রীদেবী, কে মাধুরী, কে জুহি চাওলা! আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে ব্ল্যাক ফরেস্ট আর রাইন নদীর পারে। বন্ধুরা সিনেমা দেখে, সলমন–ভাগ্যশ্রী, কবুতর যা যা যা। আমি উইম্বল্ডন দেখি। দেখি সবুজ ঘাসে এক সফেদ কবুতরি উড়ে বেড়াচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। নিখুঁত ফার্স্ট সার্ভে উড়ে যাচ্ছে তাঁর পনিটেল। যেন স্বর্ণালী শস্যগুচ্ছ। ফোরহ্যান্ডের মসৃণ পেলবতায় জার্মানি তরুণীর স্কার্ট যেন ইরানি কিশোরীর ঘাঘরা–ঘূর্ণি হাওয়ায় দোলে।

আশির দশক পেরিয়ে নব্বই এল। সোভিয়েত ইতিহাস হয়ে গেল। এক হয়ে গেল দুই জার্মানি। আর আমার ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। মানে, স্কুল ব্যাগ থেকে একগাদা স্পোর্টসস্টার বেরিয়ে পড়ল। তার সবগুলোতেই ছিল স্টেফি গ্রাফের ছবি। একটা বই চুরি গিয়েছিল। কে চুরি করেছিল, জানতে পারিনি। স্কুলের বন্ধু বাপ্পাদিত্য খুব সাহায্য করেছিল। টিফিন টাইমে সবাই যখন মাঠে, আমি আর বাপ্পাদিত্য সবার ব্যাগ খুলে খুলে সার্চ করেছিলাম। চোরাই মাল পাওয়া যায়নি।

নতুন শতাব্দী এল। বিশ্বাসঘাতিনী স্টেফি বিয়ে করল আগাসিকে। এবং লজ্জা– ঘেন্নার মাথা খেয়ে বাচ্চা–কাচ্চার জন্মও দিল। আমিও মনের ব্যথা মনে চেপে খাঁটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে উদ্যোগী হলাম।

এরপরেও কয়েক বছর কাটল। স্কুলের রি–ইউনিয়নে আবার দেখা হল বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে। কথায় কথায় উঠল আমার স্টেফি প্রেমের কথা। উঠল আমার সেই বই চুরির কথা। বাপ্পাদিত্য হাসতে হাসতে বলল, বইটা আসলে সে–ই চুরি করেছিল। সবার ব্যাগ সার্চ করা হলেও তার ব্যাগটাই আমি সার্চ করিনি।

হৃদয় কী বিচিত্র। বাপ্পাদিত্যর হাসিতে আমিও হো হো করে যোগ দিলাম। অথচ, আটের দশকে হলে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

Taste to believe it

শারদ শুভেচ্ছা

Sacks Bee's ROYAL Leaf

WANTED URGENTLY
Area Wise Financially Sound
Distributors and Professionals
9830201142, 8335044913

Brand Owned By : SACKS BEE
14/20, Uday Sankar Sarani, Kolkata - 700 033
AN ISO 22000 : 2018 & CODEX GMP Certified Company
Packed at : Gobindapur, Banepukur, Mahestala, BBT Road, Kolkata-700 141
Email : sacksombee@gmail.com ◆ website : www.sacksbee.com

শুভ দীপাবলি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জীবনাগর সন্দেশ

ভারতের মিষ্টান্ন জগতে
অদ্বিতীয়

ভীম চন্দ্র নাগ

৫, নির্ম্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন: ২২১২-০৪৬৫
শাখা: বিবেকানন্দ রোড, জোড়াসাঁকো ফোন: ২২৬৯ ৭৯০৮

স্থাপিত- ১৮৮৫
দীপাবলী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভ কামনায়

সেন মহাশয় প্রাঃ লিঃ
কোলকাতা

সর্বজন প্রিয় মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান
শ্যামবাজার- 7603094441/9647247252
সল্টলেক- 9163764343/7437994076
লেক মার্কেট- 9163941121/7076403343
ভবানীপুর- 9874603383
হাইকোর্ট বিল্ডিং- 9051729973

শ্যামলী বৃদ্ধাশ্রম
(Govt. Regd.)
উলুবেড়িয়া, কুলগাছিয়াতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা/ প্রতিবন্ধী/ শয্যাশায়ীরা বাড়ির মতো থাকুন। চিকিৎসা ও আয়ার ব্যবস্থা আছে।
9433078824

সেবা বৃদ্ধাবাস
সর্বক্ষণের আয়ার দ্বারা সেবা যত্ন, চিকিৎসার সুবিধাসহ সুস্থ / অসুস্থ / প্রতিবন্ধীদের থাকার সুব্যবস্থা।
9674106539
9674484104

আজই হোক প্রেম দিবস

অনন্যা পোদ্দার

শহরের পথে হঠাৎ পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে চলে গেলাম ভিক্টোরিয়া। জীবনের চল্লিশটা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত পেরিয়েও কোনওদিন মাঠে বসে নিজের আপন মানুষটার সঙ্গে একান্তে দুটো গল্প করা হয়নি কখনও | তাই আজ প্রথম ভিক্টোরিয়ার মাঠে সবুজ ঘাসের উপরে তার সঙ্গে বসে ছবি তুললাম, সাক্ষী হিসেবে রাখলাম ভিক্টোরিয়ার পরীকে। ক্যামেরাবন্দি করে রাখলাম কিছু সুন্দর মুহূর্ত।

সংসারে থেকে আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতে গিয়ে কখন যেন টিপিকাল স্বামী-স্ত্রী হয়েই রয়ে যাই আমরা। মনে মনে ভাবি, আমাদের মধ্যবর্তী প্রেমটুকুতে বোধহয় শেষ মাটিটাও ঢেলে দিয়ে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তা বোধহয় সত্যি নয়। আমরা সংসারে থাকলে নিজের মানুষটার কাছে থেকেও কাছে থাকি না। ঘরে ফিরলেই আমরা সন্তান, শ্বশুর শাশুড়ির মাঝে হারিয়ে যাই। একে অপরের প্রতি সামান্যতম চাওয়া পাওয়াটুকুও তখন দায়িত্বের কাছে ওজনে কম পড়ে যায়। তাই একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকতেও আমরা সবাই দিনান্তে শুধুই স্বামী-স্ত্রী।

তাই বলছি, বেরিয়ে পড়ুন। ক্যালেন্ডার থেকে যে কোনও একটা দিন এমনি এমনিই বেছে নিন। তারপরে শহরের পথে ঘাটেই ঘুরে বেড়ান একে অপরের সঙ্গে। সিনেমা দেখুন, আইসক্রিম খান, হাতে হাত ধরে ছবি তুলুন। দেখুন, এই তিলোত্তমার পথেই আপনার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিককে খুঁজে পাবেন। তিনি হয়তো এখন পঞ্চাশের দোরগোড়ায়, বা পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। তাই একটু রাসভারি গলায় বলে বসবেন, 'আঃ, এসব

ছেলেমানুষি কেন আবার?’

তবু আপনি ছাড়বেন না, ছেলেমানুষি-টা করেই যাবেন। দেখবেন, কিছু সময় পরে সেই মানুষটা স্বামীর খোলস ছেড়ে প্রেমিক হয়ে আপনার হাতে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করেছেন।

তাই বন্ধুরা, প্রেম দিবসের অপেক্ষায় বা একটা জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। হঠাৎ করেই বেরিয়ে পড়ুন দুজনে, ছেলে মেয়েদের স্কুল, কলেজে পাঠিয়ে দিলে আর আপনারা তাদের নন। তারা যদি জীবনে বাবা মাকে রেখে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড-কে নিয়ে ডেটিংয়ে যেতে পারে, তাহলে আপনারা কেন যেতে পারবেন না ছেলে মেয়েদের রেখে!

জীবনের সব মুহূর্ত না হলেও কিছু মুহূর্ত একে অপরকে দিন। সম্পর্কের বয়স বাড়লে তারও তো যত্নের প্রয়োজন হয়, আর সেই যত্নের নাম ‘একটু একে অপরকে একান্তে সময় দেওয়া।’ তাই বেরিয়ে পড়ুন শহরের পথে ঘাটে, সিনেমা হলে, গঙ্গার বক্ষে ভেসে চলুন, মেলায় হারিয়ে যান... যা ইচ্ছে হয়, তাই করুন। শুধু শর্ত একটাই, একে অপরের হাত দুটো যেন ধরা থাকে শক্ত করে। তাই প্রাণ ভরে বাঁচুন, ভালোবেসে বাঁচুন। বিশ্বাস রাখুন ভালোবাসায়, ভাল রাখায় নয়। কাল কে দেখেছে বলুন! তাই জীবনের সবটুকু প্রেম আজই উজাড় করে দিন তাকে, আজই হোক প্রেমদিবস, আজই নেমে আসুক চির বসন্ত!

স্মার্টফোন থাকা মানেই সে স্মার্ট!

স্মার্টফোন অনেকেরই থাকে। থাকাটা অন্যায় নয়। কিন্তু যাঁরা সবসময় সেই ফোনে মুখ গুঁজেই আছেন, তাঁরা কি সত্যিই খুব স্মার্ট? বিদেশি গবেষণা কিন্তু অন্য কথা বলছে। সেই গবেষণার হদিশ দিলেন প্রসূন মিত্র।।

স্মার্ট মানে চালাক। কিন্তু যারা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে তাঁদের অধিকাংশই আনস্মার্ট অর্থাৎ বোকা। বিদেশের তিনটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা থেকে এমনই তথ্য জানা যাচ্ছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা আলাদা সমীক্ষা চালালেও ফলাফল মোটামুটি এক। তার সারকথা হল, যে যত বড় হাঁদা গঙ্গারাম সে তত বেশি স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে।

তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Rice University যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়েছিল US Airforce এর সঙ্গে। সমীক্ষায় জানা গেছে, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীরা বুদ্ধির দিক থেকে পুরোপুরি যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাদের ধারণা, ফোন তাদের সব কিছু বলে দেবে। তারা এতটাই বোকা যে মানচিত্র দেখে কোন জায়গা চিনতে পারেন না।

University of Waterlooর সমীক্ষাতেও একই ফলাফল। ৬৬০ জনের ওপর পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছে, যারা দিনরাত মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিকের থেকে কম।

আরও মারাত্মক তথ্য উঠে এসেছে Psychology Today পত্রিকায়। মনস্তত্ত্বের বিখ্যাত এই পত্রিকা স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের কিছু প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের আগে তাদের হাত থেকে ফোন নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পত্রিকাটি জানাচ্ছে, এই ব্যক্তিরা এতটাই বোকা যে, 'কোন দুটি সংখ্যা যোগ করলে ৩ হয়?' এই জাতীয় সহজ প্রশ্নের উত্তরও মবাইলের সাহায্য ছাড়া দিতে পারেননি।

University of Essex এর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীরা মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন না। মার্কিন গবেষক David Wygnat এর মতে, মানুষের বাস্তববোধ বৃদ্ধি পায় অভিজ্ঞতা থেকে। যে যত বেশি মানুষের সঙ্গে মেশে, তার অভিজ্ঞতা তত বেশি। স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের এই অভিজ্ঞতা একেবারেই কম। কারণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে তারা কারও সঙ্গে মেশার সময় পায় না।

কলকাতার এক মনোবিজ্ঞানীর দাবি, পৈতে দেখে যেমন বামুন চেনা যায়, তেমনই দিনরাত স্মার্ট ফোনে মুখ গুঁজে থাকা ব্যক্তিকে খুব সহজেই গবেট বলে চিনে নেওয়া যায়।

দাদাগিরির মোক্ষম গুগলি প্রতিদানের বৃত্ত সম্পূর্ণ

প্রশান্ত বসু

দাদাগিরির একটা জনপ্রিয় বিভাগ আছে— গুগলি। নানা রকম ধাঁধা বলে প্রতিযোগীদের একটু ভড়কে দেওয়া। সিএবি নির্বাচনেও এল একটা মোক্ষম গুগলি। যে ধাক্কা সামলে উঠতে পারলেন না বিরোধীরা।

পরবর্তী বোর্ড সভাপতি হিসেবে তাঁর আর থাকা হচ্ছে না। এটা পরিষ্কার হওয়ার পরই কলকাতায় ফিরে সৌরভ গাঙ্গুলি জানিয়েছিলেন, তিনি সিএবি-র নির্বাচনে লড়বেন। সিএবি সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করবেন।

আগেও তিনি সিএবি সচিব ছিলেন। পরে সভাপতি হয়েছিলেন। তারপর গিয়েছিলেন বোর্ডের দায়িত্বে। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী, যে তিন বছর তিনি বোর্ডে ছিলেন, সেই সময়টা সিএবি-র বাইরে ছিলেন। ফলে, সেই সময়টাকে কুলিং অফ ধরাই যায়। সেক্ষেত্রে সৌরভের ফের সভাপতি হতে আইনগত কোনও বাধা ছিল না।

কিন্তু ক্রিকেট প্রশাসনের নির্বাচন তো সব-সময় ক্রিকেটীয় ফর্মুলায় হয় না। এখানে অনিবার্যভাবেই এসে যায় রাজনীতির নানা সমীকরণ। বোর্ডে থাকতে গেলে যেমন বিজেপির স্নেহধন্য হতে হয়, ঠিক তেমনই সিএবি-তে থাকতে গেলে মুখ্যমন্ত্রীর অদৃশ্য আশীর্বাদ থাকতেই হয়। অর্থাৎ, সিএবিতে নতুন ইনিংস শুরু করতে গেলে রাজ্য সরকারের মদত ছাড়া

সম্ভব নয়। এই সহজ সত্যিটা তাঁর থেকে ভাল আর কে বোঝেন!

এখন সৌরভ গাঙ্গুলি সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলে তৃণমূল সরাসরি নির্বাচনে জড়াবে না। সিএবি-তে বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতদেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুলতুবি রেখে গুটিয়েই থাকতে হবে। হয়ত সেই কারণেই নিজের নামটা ভাসিয়ে দিলেন। একসময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, যখন বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার জায়গায় রইল না। তাঁরা আগাম ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছেন। ঠিক মোক্ষম সময়ে এল দাদাগিরির সেই গুগলি। অর্থাৎ, অফস্টাম্পের বাইরের বলটা পা বাড়িয়ে ছেড়ে দিলেন। নিজে সিএবি সভাপতি না হয়ে এগিয়ে দিলেন দাদা স্নেহাশিস গাঙ্গুলিকে।

তিন দশকেরও বেশি আগে এক রনজি ফাইনাল। বাংলা দলে তখন অনেকটাই অপরিহার্য স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। বাংলা ক্রিকেটের আঙিনায় তখনও সৌরভ গাঙ্গুলি নামটা সেভাবে ভেসে ওঠেনি। ফাইনালের আগেরদিনই মোক্ষম চমক। অলরাউন্ডার হিসেবে নেওয়া হল সৌরভকে। বাদ গেলেন দাদা স্নেহাশিস। রনজি জয়ী দলে থাকতে না পারার সেই আক্ষেপ নিশ্চয় এখনও বয়ে বেড়ান স্নেহাশিস।

তিন দশক পর এবার সৌরভের পালা। সেদিন দাদা স্নেহাশিস জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন ভাই সৌরভকে। এবার ভাই সৌরভ সভাপতির আসন ছেড়ে দিলেন দাদা স্নেহাশিসকে। প্রতিদানের একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হল।

খেলা

খেলার মাঠে ঘৃণার চাষ খুব জরুরি!

সোহম সেন

সুনীল গাভাসকারকে দেখে এগিয়ে আসছেন বাবর আজম। বুঝে নিতে চাইছেন তাঁর ব্যাটিংয়ে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে। সানির মনেও কোনও ছুঁৎমার্গ নেই। তিনিও তাঁর মতো করে বোঝাচ্ছেন, সমস্যাটা কোথায়।

চোট সারিয়ে ফিরে এসেছেন মহম্মদ সামি। তাঁর কাছে হাজির চোট সারিয়ে ফিরে আসা পাক বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি। বলছেন, তোমার মতোই হতে চেয়েছি। সামিও কী অবলীলায় শিখিয়ে দিচ্ছেন আফ্রিদিকে।

বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের দেখে একবার হ্যান্ডশেক করে যাচ্ছেন পাক জুনিয়র ক্রিকেটাররা। দু'চোখে বিস্ময়। কেউ সই চাইছেন। কেউ জার্সি। কেউ বলছেন, এবার আমাদের দেশে খেলতে আসুন।

এই তো সেদিন। মরুশহরে হচ্ছে এশিয়া কাপ। শচীনের এক ভক্ত সুধীর কুমার। ভারতের যেখানেই খেলা থাক, তিনি ঠিক গ্যালারিতে হাজির হয়ে যাবেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানেরও এক এমনই পাগল সমর্থক আছেন— বসিরচাচা। যেখানেই পাকিস্তানের খেলা, বসিরচাচাও হাজির।

এবার সুধীর যেতে পারবেন কিনা, সংশয়ে ছিলেন। বসিরচাচাও নাছোড়, আসতেই হবে। তিনিই কিনা বিমানের টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিলেন সুধীরের জন্য। গ্যালারিতে একজনের গায়ে ভারতের পতাকা, একজনের গায়ে পাকিস্তানের।

ভারত-পাক ম্যাচের এমন কত টুকরো টুকরো সম্প্রীতির ছবি ছড়িয়ে আছে। একসময় বলা হত, কাশ্মীর সমস্যা কোনও সমস্যাই নয়। গাভাসকার আর ইমরান খানকে বসিয়ে দাও। ওরা দুজন ঠিক মিটিয়ে দেবেন। এই ভারতের কত রমনী যে ওয়াসিম আক্রামকে মনে মনে প্রেম নিবেদন করেছিলেন, তার ঠিকঠাক সমীক্ষা হলে সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই লাখ ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু সেই ভারত খেলতে যায় না পাকিস্তানের মাটিতে। পাকিস্তান যে এ দেশে আসবে, তারও উপায় নেই। আমাদের দেশের

আইপিএলে অচ্ছুৎ হয়ে থাকতে হয় পাক ক্রিকেটারদের। কোন ফ্র্যাঞ্চাইজির ঘাড়ে কটা মাথা তারা পাকিস্তানের খেলোয়াড়কে দলে নেবে!

আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম ঘোষিত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর এই দুই দেশের কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ রাখা হয়নি। তার মানে আগামী পাঁচ বছরও এক দেশ অন্য দেশে টেস্ট বা একদিনের সিরিজ খেলতে যাবে না। আগাম এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বোর্ডকর্তারা? এখন তো আবার বোর্ডে সৌরভ নেই। জয় শাহ আরেক ধাপ ওপরে। তিনি আগ বাড়িয়ে ঘোষণা করে দিলেন, এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে যাবে না ভারত। তিনি ভারতীয় বোর্ড সচিব হওয়ার পাশাপাশি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি। আগ বাড়িয়ে এখন থেকে এমন ঘোষণা করা খুব জরুরি ছিল?

দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলছেন, সরকার অনুমতি না দিলে কিছু করার নেই। সরকার যে অনুমতি দেবে না, সেটা আগাম জয় শাহ ঘোষণা করে দিলেন! বাবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে সরকারি সিদ্ধান্ত ছেলেই ঘোষণা করে ফেললেন। কোনটা প্রকাশ্যে বলতে নেই, কোনটা আগাম বলতে নেই, এই ন্যূনতম বোধটুকুও যাঁর নেই, তিনি কিনা দেশের বোর্ডসচিব! তিনি কিনা বকলমে বোর্ড চালাবেন! ওই যে, বাবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলে যা হয়!

এই দুই দেশের শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয়েছে এক দশকেরও আগে। খেলার মাঝে

এমন যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহ কারা আনতে চাইছেন? ভারত-পাক রেশারেশি তো আগেও ছিল। তাই বলে গাভাসকার-কপিলদেবরা কি পাকিস্তানে যেতেন না? নাকি ইমরান, মিয়াদাদরা ভারতে আসতেন না?

সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারত যেবার পাকিস্তানে গেল, সেবার পাক সফরে যাওয়ার আগে তাঁরা দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে। বাজপেয়ী কী বলেছিলেন, আজও প্রবাদ হয়ে আছে। তিনি সৌরভ-শচীনদের বলেছিলেন, 'দিল ভি জিতকে আনা।' অর্থাৎ, হৃদয়ও জিতে এসো। একজন রাষ্ট্রনায়কের কাছে এমনটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এখন পরিবেশটাই পাল্টে গেছে। জাতীয় চ্যানেলে সারাক্ষণ পাক বিরোধী জেহাদ। প্রতিদিন একটা করে যুদ্ধের আবহ তৈরি করো। যাই ঘটুক, এর সঙ্গে পাকিস্তানকে জুড়ে দাও। মনে মনে ঘৃণা ঢুকিয়ে দাও। রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ছাড়া এমন প্রোপাগান্ডা চলতে পারে!

একা বিজেপিকে দায়ী করে লাভ নেই। ইউপিএ আমল থেকেই সিরিজ বন্ধ রাখার তোড়জোড়। আইপিএলে পাক ক্রিকেটারদের অচ্ছুৎ রাখার কাজটা প্রথম হয় ইউপিএ আমলেই। তাই তারাও আজকের এই পরিস্থিতির দায় অস্বীকার করতে পারে না। মুম্বইয়ে তাজ হোটেলে উগ্রপন্থী হামলার সঙ্গে ক্রিকেটকে জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা তখনও দেখা গেছে। এই আমলে দিন দিন সেটা বাড়ছে। সরকারি উদ্যোগে ঘৃণার বিপুল বিস্তার। মাঝখান থেকে খেলাটাই বন্ধ হয়ে গেল। ওই দেশে সিরিজ খেলতে যাওয়া চলবে না। ওই দেশ থেকে এই দেশে সিরিজ খেলতে আসা যাবে না। ঘৃণার রাজনীতিকে ক্রিকেটের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

এক দশকের ওপর সিরিজ বন্ধ তো রাখলেন। এতে দুই দেশের সম্পর্কের কী উন্নতিটা হল? সেই আবহমান কাল ধরে শুনে আসছি, কাশ্মীর সমস্যা। এখনও সেই কি সেই সমস্যা কমেছে? বরং অনেক বেড়েছে। ভোট এলেই একটা করে সার্জিকাল স্ট্রাইক দেখাতে হবে। বীরত্বের ফানুস ওড়াতে হবে। নিজেদের সব অক্ষমতাকে আড়াল করতে দেশপ্রেমের হাওয়া তুলতে হবে। সামনের বছর ভোট। ধর্মের সুড়সুড়ির পাশাপাশি আরও একটা মোক্ষম তাস চাই। পাকিস্তান তো আছে। মাঝে মাঝে ভাবি, ভাগ্যিস একটা পাকিস্তান আছে। নইলে, এরা কী বলে ভোট চাইত? কী বলে হাওয়া গরম করত?

রাজনীতির ব্যাপার রাজনীতির লোকেরা বুঝুন। তার সঙ্গে খেলাকে না জুড়লেই নয়! নিজেরা সমস্যা মেটাতে পারছেন না। সেই ব্যর্থতার বোঝা খেলাধূলার ওপর কেন চাপাচ্ছেন? যে সম্প্রীতি আপনারা আনতে পারেননি, তা ক্রিকেটাররাই পারেন। ওঁদের খেলতে দিন। এই দমবন্ধ আবহে ওঁরা অন্তত তাজা অক্সিজেন আনতে পারবেন।

পড়শি রাজ্যে সাতটা দিন

রাজর্ষি সরকার

এ বাবা ঝাড়খণ্ড যাচ্ছিস? ওখানে আবার কী দেখার আছে? এ বাবা, রাঁচি যাবি ওই পাগলা গারদ দেখতে? এরকম আরও অনেক কথা অনেক মানুষের কাছ থেকে শুনতে হয়েছিল যখন এই বছর ঠিক করেছিলাম দুজন বন্ধু মিলে নিজেদের গাড়ি করে ঝাড়খণ্ড যাব। তবে ঘুরে এসে ছবি দেওয়ার পর সেইসব মানুষরাই বলতে শুরু করেছে, এই জায়গাটা দারুন, এটা কোথায়? আমার উত্তর তখন ছিল এটা ওই পাগলা গারদের ভিতরটা। এতটাই সুন্দর। কারণ আমার মতো প্রকৃতি পাগলদের জন্য প্রকৃতির এই দৃশ্যপট তো পাগলা গারদের মতোই।

প্রতিবারের মতো এবারও পুজোয় কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছিল। কারণ বেশ অনেকদিনই কোথাও বেরোনো হয়নি। হাতে মাত্র সময় ছিল একমাস। নিজেদের গাড়িতে করে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম ঝাড়খণ্ড যাব। রাঁচি, বেতলা, নেতারহাট এবং সেটা দেখতে দেখতে আরও এক দারুন জায়গার খোঁজ পেলাম। যেটা দেখার পর থেকে সেখানে না যাওয়ার কোনও কারণই পাচ্ছিলাম না। এক প্রকার দেখে পাগল হয়েগেছিলাম। সেটা হল

মারোমার্ ফরেস্ট রেস্ট হাউস। সেটা বুকিংয়ের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল যদিও, কিন্তু পেয়েছিলাম। আর সেই কষ্ট বিফলে যায়নি।

যাই হোক, সেই কথায় পরে আসছি। যথারীতি পুরো প্রোগ্রাম সাজিয়ে ফেললাম এবং মাত্র দুজন বন্ধু মিলে গাড়িতে করে যাওয়া ঠিক করে ফেললাম। ২ তারিখ সকালে রওনা এবং ৯ তারিখ ফেরা। রাঁচি, পত্রাতু, মারোমার্, বেতলা, নেতারহাট এই ছিল আমাদের ট্যুর প্ল্যান। বেশ অনেকটাই জার্নি এবং বড়ো প্ল্যান। ইচ্ছা আর মনের জোরটাই আসল। এটা মাথায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

যাত্রা শুরু ভোর সাড়ে পাঁচটায়। মোট রাস্তা ৪১০ কিমি। রুট ছিল কলকাতা, কোলাঘাট, খড়্গপুর, জামশেদপুর, রাঁচি। প্রথম দাঁড়ালাম কোলাঘাটের একটু পর ব্রেকফাস্ট সারার জন্য। তারপর আবার যাত্রা শুরু। রাস্তার বর্ণনা আর না করাই ভাল। অপূর্ব রাস্তা। আর জামশেদপুরের আগে থেকেই দু'পাশের দৃশ্য পাল্টাতে থাকে। ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। পাহাড় বলা হয়তো ভুল হবে। তাও বললাম। রাস্তার দৃশ্য অপূর্ব চারিদিকে। রাঁচি ঢোকার আগে দশম ফলস এবং চান্ডিল ড্যাম দেখে নিলাম। কারণ, ওই দুটো জায়গা রাঁচি ঢোকার আগে পড়ে। দুটো জায়গাই অপূর্ব। সব দেখে আমরা সেদিন রাঁচি ঢুকলাম বিকেল সাড়ে চারটেয়। মোট সময় লাগল ১১ ঘন্টা। দু'বার খেতে দাঁড়ানো, দু'বার দৃশ্য দেখতে দাঁড়ানো, দশম ফলস, চান্ডিল ড্যাম সব মিলিয়ে। টোল ট্যাক্স দিতে হয়েছে মোট ৫০৫ টাকার।

পরের দিনের প্ল্যান ছিল জোনহা ফলস, সীতা ফলস, হুণ্ডু ফলস, গেতালসূদ ড্যাম। রাঁচি শহরের ভিতরের রাস্তাও বেশ ভাল। কোথাও পৌঁছাতে কোনও অসুবিধা হয়নি গুগল ম্যাপকে ভরসা করে। জোনহা ফলসে প্রায় ৪০০ সিঁড়ি, সীতাতে ৩৫০ সিঁড়ি এবং হুণ্ডু ফলসে ৭৫০ সিঁড়ি। মাঝে মাঝে বসার জায়গা অনেক আছে। ভেঙে ভেঙে উঠতে চাইলেও কোনও সমস্যা হবে না। আমার ব্যক্তিগতভাবে সীতা ফলসটা খুব সুন্দর লেগেছে। চারপাশের পরিবেশটা বেশ সুন্দর জঙ্গলে ঘেরা। বাকি গুলোও দারুন। সকাল ৯ টায় আমরা বেরিয়েছিলাম। সেদিন সব দেখে হোটেলে ফিরলাম সন্ধে ৬ টা নাগাদ। সন্ধেবেলা বেরিয়ে হোটেলের চারপাশটা, মানে রাঁচির রাস্তায় একটু ঘুরছিলাম। আপনার হঠাৎ মনে হতেই পারে আপনি কোনও শপিং মলের

ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশাল বড় প্রতিটা ব্র্যান্ডের আলাদা আলাদা ঝাঁ চকচকে দোকান। সে এক জাঁকজমকপূর্ণ ব্যাপার। বেশ ভালই লাগল।

পরদিন বেরিয়ে পড়লাম সকাল ৯ টায়। গন্তব্য পত্রাতু ভ্যালি, পত্রাতু লেক, কানকে ড্যাম, টেগোর হিল। রাস্তা সেই আগের মতোই অপূর্ব। পত্রাতু ভ্যালিতে গাড়ি করে ওঠার মজা কোনও পাহাড়ে ওঠার চেয়ে কম না। ঘোরানো পেঁচানো অপূর্ব রাস্তা। পৌঁছানোর পরে ভ্যালির দৃশ্য দেখে চোখ মন সব ভরে গেল। অসাধারণ একটি জায়গা। ভ্যালি থেকেই লেকটা দেখা যায়। যেতে ইচ্ছা করছিল না ভ্যালি থেকে।

যাই হোক, কষ্ট করে বেরিয়ে গেলাম চলে গেলাম লেকে। সেটাও দারুন। দৃশ্য ভাল হলেও মোটামুটি লেকের চারপাশে মেলা বসেছে। প্রচুর মানুষ, প্রচুর দোকান, মাইকে গান হচ্ছে, বোটে ওঠার জন্য ডাকাডাকি হচ্ছে, সে এক ব্যাপার বটে। আমরাও স্পিড বোট সফর করলাম। বেশ মজাদার ব্যাপার। লেকটায় ঘোরাবে মিনিট ২০-২৫। বেশ সুন্দর অভিজ্ঞতা। সব সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে কানকে ড্যাম আর টেগোর হিল দেখে ফেললাম। টেগোর হিলের একদম ওপর থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। খুব সুন্দর একটি ভিউ। সব দেখে সেদিন হোটেল ফিরলাম ৫ টা। পরেরদিন এর জন্য উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল, কারণ পরেরদিন মারোমার্ এর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা।

চতুর্থ দিন। সকাল সকাল উঠে বেরিয়ে পড়লাম মারোমারের উদ্দেশ্যে। বেশ অনেকখানি রাস্তা। রাঁচি থেকে প্রায় ১৭০ কিমি। ৪ ঘন্টা লেগে যাবে। অসাধারণ রাস্তা এবং অসাধারণ রাস্তার চারপাশের দৃশ্য। বর্ণনা করা সত্যি কঠিন।

তার থেকে বরং মুগ্ধ হওয়াই বেশি সহজ। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা পেরিয়ে যেতে হবে। অনেকবারই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য। মারোমার্ আসার পথে বেশ কিছু ছোটোখাটো বাজার পড়ে। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার থাকলে এখান থেকে কিনে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের লাগলো প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা। কারণ রাস্তায় অনেকবার দাঁড়িয়েছি। দুপুর ২ টো নাগাদ পৌঁছালাম মারোমার্ ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। আমাদের ট্রি হাউস বুক করা ছিল। সেখানকার দৃশ্য এবং চারপাশ চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতোই। দুপুরে দেশি মুরগি দিয়ে ভাত খাবার অভিজ্ঞতাও দারুন। সেদিনটা শুধুমাত্র রুমের বারান্দায় বসে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতেই করতেই কখন সময় কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। দিনের এক রূপ, রাতের রূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম। জঙ্গলের ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ, চারিদিক অন্ধকার (কারণ, মারোমার এ সন্ধের পরে লাইট থাকে না)। আকাশে মেঘের খেলা, চাঁদের উঁকি মারা, পাস্ দিয়ে বয়ে চলা ঝর্নার শব্দ, সাঙ্ঘাতিক নিস্তব্ধতা। আরও কত কী, বোঝানো কঠিন। না গেলে এ জিনিস উপভোগ করা যাবে না।

অসাধারণ একটা রাত কাটানোর পরে পঞ্চম দিনের গন্তব্য ছিল বেতলা ফরেস্ট, কেচকি সঙ্গম এবং পালামৌ ফোর্ট। যেতে একটু বেলা হয়ে যাওয়ায় বেতলা সাফারিতে সেরকম কিছু দেখতে পাইনি। কিছু হরিণের পাল, বাঁদর এবং হনুমান ছাড়া। তবে জঙ্গলের নিজস্ব একটা সৌন্দর্য থাকে। তার নিজস্ব একটা আমেজ থাকে। সেটাই বা কম কী? বেতলা দেখে চলে গেলাম কেচকি সঙ্গম দেখতে। ফেরার পথে পালামৌ ফোর্ট। ফিরে এলাম দুপুরের মধ্যে। খাওয়াদাওয়া সেরে আবার সেই অসামান্য দৃশ্য আর পরিবেশ উপভোগ করা।

রাতেরবেলা উপরি পাওনা হিসেবে শুনেছিলাম হাতির ডাক, একবারই। তবে সেটাই পিলে চমকানোর জন্য যথেষ্ট। টর্চ জ্বালিয়ে একটু খুজেঁওছিলাম চারিদিকে, যদি দেখা যায়। কিন্তু দেখতে পাইনি।

ছ'নম্বর দিনের অভিজ্ঞতা পুরো অন্যরকম। আমাদের এই দিনের প্ল্যান ছিল মারোমার্ থেকে বেরিয়ে সামনেই একটা মিরছাইয়া ফলস আছে। সেটা দেখে তারপর সুগ্গা বাঁধ এবং লোধ ফলস দেখে নেতারহাট পৌঁছানো। তবে বাধ সাধল আমাদের গাড়ি। গাড়িতে কিছু সমস্যা হওয়ার কারণে আমরা সেদিন কোথাও যেতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল গাড়ি সারিয়ে নেতারহাটে চলে যাওয়ার। কিন্তু গাড়ি সারাতে সারাতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি পুরো ঠিক না হওয়ায় পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার রিস্ক নিতে চাইনি। ঠিক করলাম, কোনওমতে এখানে রাত কাটিয়ে সকালে রাঁচি পৌঁছে গাড়িটা পুরো ঠিক করে নেওয়া হবে। সেদিন মারোমার্ কিছুটা আগে গারু বাজারের কাছে গাড়ি সারাতে সন্ধে ৭ টা বেজে গিয়েছিল। তবে সন্ধে ৭ টা বাজার পরে আমাদের আর কোথাও যাওয়ার উপায়

ছিল না। কারণ, ওখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র মারোমার্ ট্রি হাউস ছাড়া। সেটিও পুরো বুক ছিল সেদিন। ভেবেছিলাম জঙ্গলের মধ্যে গাড়িতে বসে রাত কাটাতে হবে। যাক, সেটা করতে হয়নি। ডালটনগঞ্জ অফিসে ফোন করে ঘটনাটা জানানো হল। বলা হল, দেখছি, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঠিক ১৫ মিনিট পরেই আমার ফোনে একটা ফোন এল। রিসিভ করে আনন্দ এবং উত্তেজনা দুটোই এক-সঙ্গে হল। ওখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার স্যার নিজে ফোন করেছিলেন। বললেন, কোনও চিন্তা নেই। সামনেই আমার বাংলো। আপনারা ওখানে চলে আসুন। রাতে থেকে যাবেন। যথারীতি সেখানে গেলাম এবং রেঞ্জার স্যার নিজে আমাদের সঙ্গে দেখা করে রুম দেখিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর চলে গেলেন। খুবই ভাল লাগল মানু-ষটিকে। সেই বাংলো এবং আন্তরিক ব্যবহার দুটোই মনে থেকে যাবে।

সপ্তম দিন। প্ল্যান মতো এই দিনের কাজ ছিল কোনওভাবে রাঁচি পৌঁছে গাড়ি ঠিক করে নেওয়া। সকাল সকাল রেঞ্জার স্যারের সঙ্গে একবার দেখা করে বেরিয়ে পড়লাম রাঁচির উদ্দেশ্যে। ঠিক করেছিলাম রাস্তায় গাড়ি সমস্যা করলে লাতেহার বাজারে গাড়ি সারাবো। কিন্তু গাড়ি কোনও সমস্যা করেনি। একেবারে রাঁচি পৌঁছে গেছি। তারপর সেখানে গাড়ি ঠিক করিয়েছি। গাড়ি ঠিক করে নিয়ে আরও একবার পত্রাতু ভ্যালি থেকে ঘুরে এসেছি, যেহেতু কিছু করার ছিল না।

এবার চলো মন নিজ নিকেতনে। কলকাতা ফেরার দিন। ফেরার পথে জামশেদপুরের কাছে ডিমনা লেক ঘুরে নিয়েছিলাম। বেশ সুন্দর জায়গা। ফেরার দিন আমরা সকালে বেরিয়েছিলম ৬ টায়। কলকাতা পৌঁছোলম দুপুর দুটো নাগাদ।

বরফে শায়িত বুদ্ধ আমরা সবাই চন্দ্রাহত

অরূপ ঘোষ

—অরূপ! এই অরূপ! ওঠ! দেখ মেঘ কেটে গেছে! চাঁদ দেখা যাচ্ছে!

— ফালতু বাওয়াল করিস না পুটু। ঘুমা, আর আমাকেও ঘুমাতে দে। চোখ না খুলেই ব্ল্যাঙ্কেট-টাকে আরেকটু ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

— আরে ভাই বাইরে চল, দেখে আসি।

— তুই যা, দেখে এসে আমাকে ডাকিস।

ব্ল্যাঙ্কেটে ভালো করে প্যাকিং হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

আর তার ঠিক এক মিনিট পর আমাদের ঘরটায় একটা ঝড় উঠল। ঝড়টা তুলল প্রণবেশ।

—গোটা ঘরে ছুটছে আর সবাইকে ডেকে

ডেকে তুলছে, ওঠো! ওঠো! সবাই ওঠো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে! স্লিপিং বুদ্ধ দেখা যাচ্ছে! অরূপ রে ওঠ, সঙ্গীতদা ওঠো ওঠো! অনিন্দাদি ওঠো! সৌম্য ভাই ওঠরে! বাইরে দেখবি চল!

প্রণবেশের চেঁচামেচিতে ততক্ষণে সবারই কাঁচা ঘুম ভেঙে গিয়েছে! কয়েকজন যা শুনেছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না, আর কয়েকজন প্রণবেশ কী বলছে, তা শুনতে পেলেও বুঝতে পারছে না। আসলে যা ঠাণ্ডা, তাতে মাথাও কাজ করতে সময় নিচ্ছে।

জ্যাকেট টুপি পরে যখন বাইরে আসছিলাম, করিডরটার শেষ থেকে ওপাশে কাঁচের দরজা দিয়ে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত তার রং, বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ, ভয় সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ছবিতে, ভিডিওতে অজস্রবার দেখেছি। কিন্তু নিজের চোখে প্রথমবার তাকে দেখার, বিশেষ করে চাঁদের আলোয় তাকে দেখার সেই অনুভূতি যে কেমন, যে দেখেনি তাকে বোঝানো যাবে না।

প্রথমদিকে তো বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। যখন হুঁশ ফিরল, তখন বুঝতে পারছি, পায়ের আর হাতের আঙুলগুলো ঠান্ডায় ব্যথা করছে। তাড়াহুড়োয় জুতোটাও পরিনি, হাওয়াই চটি পরেই বেরিয়ে এসেছিলাম। এক একবার মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ দেখলাম, এবার যাই জুতোটা অন্তত পরে আসি। কিন্তু একটা অমোঘ আকর্ষণ ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কিছুতেই ভেতরে যেতে দিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ভেতর থেকে ফিরে এসে যদি না দেখতে পাই। ওই রাত দেড়টার সময় যেন গোটা সান্দাকফু জেগে উঠেছে। আমাদের হোটেলের বাইরে, ওপরের ছাদে ওই ঠান্ডার মধ্যেও সকলে দাঁড়িয়ে।

বাংলায় বেশ সুন্দর একটা শব্দ আছে — চন্দ্রাহত। সেদিন কোজাগরি পূর্ণিমার ওই রাত্রে সান্দাকফুতে যাঁরা হাজির ছিলেন, তাঁরা সকলেই যেন চন্দ্রাহত হয়ে গিয়েছেন। শায়িত বুদ্ধ যিনি এই বিশাল হিমালয়কে, আকাশের নয় লক্ষ তারাকে, হিমালয়ের কোলে আমাদের সবাইকে রক্ষা করে চলেছেন, তিনি চাঁদের আলোয় আমাদের সামনে শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন নিশ্চল নিশ্চুপ মৌন অথচ কী ভীষণ জীবন্ত! কী সৌম্য তার রূপ। এভাবেই যুগের পর যুগ তিনি এভাবে শুয়ে আছেন, শুয়ে থাকবেন। আমাদের রক্ষা করে যাবেন, আমাদের মোহিত করবেন, আমাদের বুকে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলবেন। বার বার মনে করিয়ে দেবেন আমরা কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ।

ঘোর কাটার পর একটা কথাই মনে মনে উচ্চারিত হয়েছে, ‘হে শায়িত বুদ্ধ, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।’

কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং

নূপুর রায়

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পাবং। গুটি কয়েক ঘর বাড়ি, একটা প্রাইমারি স্কুল, দু চারটে হোম স্টে, দুটো বিলাসবহুল ফার্ম হাউস। এ বাদে এখানে সত্যিই আর দেখার কিছুই নেই। তবে যা আছে তার হল অনাঘ্রাতা, অসামান্যা প্রকৃতি। চারিপাশে ঘিরে থাকা ন্যাওড়া ভ্যালির বিস্তীর্ণ জঙ্গল, কান পাতলেই ভেসে আসা পাখির কূজন আর মেঘের গায়ে লেগে থাকা বুনো ফুলের ঘ্রাণ। এমন একটা জায়গায় দু একদিন কাটিয়ে গেলে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

কুয়াশার ওড়না জড়ানো নীলচে সবুজ পাহাড়, এলাচের ক্ষেত, ঝাড়ু গাছের ক্ষেত চিরে নিকষ কালো একটা পিচের রাস্তা পাকদণ্ডীর মতো উঠে গেছে একেবারে উপরে, ওই সবুজে মোড়া পাহাড়ের মাথায়। ওটাই হল চারখোল।

কালিম্পঙ থেকে পাবং আসার রাস্তাটাও অসাধারণ। মন কেড়ে নেওয়া একান্ত আপনজনের মতো। প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ বর্ষণস্নাত প্রকৃতি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে, এই তো এলে, একটু জিরিয়ে গেলে না হয়।

পথের সৌন্দর্য বড়িয়েছে দুই সহোদরা গ্রাম রেলি আর পলা আর তাদের নিজস্ব দুই নদী। ভরা বর্ষায় ঝমঝমিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেচে নেচে বয়ে চলেছে চপলা বালিকার মতো। খুব ইচ্ছে ছিল পা ডুবিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। বলি, আসবো আবার। এই তো চিনে গেলাম। সে আর হয়ে ওঠেনি।

পাবংয়ে আমরা উঠলাম ভট্টরাই হোমস্টে তে।। সম্ভ্রান্ত নেপালী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘরেই পর্যটকদের থাকার

ব্যবস্থা। নিজস্ব ক্ষেত খামার, গোয়ালঘর, কাঠের দোতলা বসত বাড়ি, প্রশস্ত উঠান— সব মিলিয়ে খুব সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পুজো উপলক্ষে শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছেন। আর সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরা তিনজন। পুরো বাড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ। খুব সহজেই আমরা এবাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম।

বাধ সাধলো প্রকৃতি। আগের রাত থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, এখানে এসে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করল। টিপ টিপ, রিমঝিম, ঝমঝম কোনও উপমাতেই তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ছোটবেলায় পরীক্ষায় খুব কমন একটা রচনা ছিল— 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এর যথার্থতা জীবনের প্রথমবার মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আর বৃষ্টি একটু ধরতেই ছাতা সম্বল করে সোজা গ্রামের পথে।

প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায় এখানে তার রূপ কিছুটা ভিন্ন। পাহাড়ের কোলে অনেক সময় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দেশলাই বাক্সের মতো হঠাৎ করে একটা একলা বাড়ি নজরে আসে। এই হোমস্টে-টা অনেকটা তেমনি। বেশ কিছুটা এলাচের ক্ষেত পেরিয়ে আসতে হয়। এরপর ইতস্তত কিছু ঘর বাড়ি, নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কিছু হোমস্টে, আর তার পর একটা প্রাইমারি স্কুল। উপরে ওঠার পথে রয়েছে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ফার্ম স্টে। পাবং থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে চারখোল গিয়ে ফিরে আসা যায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় আমরা সেভাবে যাইনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে। আমরাও সেই উৎসবে সামিল হলাম। পুজো শেষে প্রসাদ খেয়ে টিকা লাগিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার আরেক প্রস্থ বৃষ্টি। তারপর এল সেই মায়াবী সন্ধে। একটা একটা করে দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠল আলো। বিন্দু বিন্দু সেই আলোগুলো জুড়ে গিয়ে তৈরি হল আলোর মালার। হিরের নেকলেসের মতো দ্যুতি ছড়ালো মেঘের গায়ে। এক সুতোয় বাঁধা পড়ল দূরপিন দাঁড়া, কালিম্পং, আলাগড়া থেকে সুদূর ভূটানের কিছু অংশ।

দূরের পাহাড়ের আলো দেখার সৌভাগ্য আগে হলেও, এত সুন্দর নির্দিষ্ট আকৃতি আগে কখনও দেখিনি। আবারও মুগ্ধ হলাম। কিছু মুহূর্ত লেন্সবন্দি হল। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাইনি তা মানসচক্ষে কল্পনা করে নিলাম। আফসোস একটাই, আবহাওয়া ভাল থাকলে এ বাড়ির উঠান কিংবা জানালা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা– সহ হিমালয়ের একটা বিস্তৃত রেঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাইনি।

খাওয়ার টেবিলে কথায় কথায় গল্প জমে উঠল। কার্শিয়াং থেকে এবাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন কাকু –কাকিমা। দু'জনই অধ্যাপক। ভাল বাংলা জানেন। ওনাদের কাছ থেকেই জানলাম পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরি–সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানলাম এই পাবং এর কথা। ১৯২০ সালে দূরপিন দাঁড়াতে আর্মি ক্যাম্প তৈরি হলে ওখানকার জনবসতিকে পাবং ও কাফের গাঁও তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ওনারা সেই ভাবেই এখানে এসেছেন। কাকু নিজে হাতে নতুন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। এই মাংস দু'দিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে কাঠের উনুনের তাপে, ফলে একটা আনকমন ফ্লেভার ছিল। খাওয়ালেন নিজের হাতে তৈরি স্পেশাল পান, মিষ্টি আরও কতকিছু। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনওটাই আমাদের প্রাপ্য পরিষেবার আন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিছু মানুষ এভাবেই মনের কাছাকাছি চলে আসেন। পরের দিন এই ভালোলাগাটুকু সঙ্গে নিয়েই চলে যাব চারখোল। ওখানেই কাটিয়ে আসব বাকি দুটো দিন।

বাংলার বাইরে অন্য এক ‘বাংলা’

সুমিত চক্রবর্তী

বাঙালির বলিহারি প্রতিভা। সব কিছুকেই সে আপন বানিয়ে নেয়। ইচ্ছেমতো নাম বদলে নেয়। সিকিমের রাবাংলার কথাই ধরুন। বিভিন্ন বইয়ে নিশ্চয় পড়েছেন রাবাংলার কথা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এর সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্কই নেই। আসল উচ্চারণ হল, রাভং লা। বাঙালিরা নিজেদের মতো করে এর উচ্চারণ তৈরি করে নিয়েছে ‘রাবাংলা’। কী আশ্চর্য, বাঙালি পর্যটকদের ভুল উচ্চারণের পাল্লায় পড়ে সেখানকার মানুষও ‘রাবাংলা’ বলতে ও লিখতে শুরু করেছে।

সিকিমে গিয়ে যদি প্রকৃতিকে দু’চোখ ভরে দেখতে চান, তাহলে আপনি রাবাংলা যেতেই পারেন। খরচ অল্প। দেখে মনও ভরবে। সিকিম বলতেই গড়পড়তা পর্যটকরা ছুটে যান গ্যাংটকে। সেখান থেকে বরফ

দেখার আশায় ছাঙ্গু বা আরও দুর্গম পথে যেতে চাইলে নাথুলা। কিন্তু যাঁরা অতটা ধকল নিতে চান না, অথচ প্রকৃতিকে দারুণভাবে উপভোগ করতে চান, তাঁদের ঠিকানা হতে পারে রাবাংলা। তাছাড়া, বরফ দেখতে যাওয়া মানে তো পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধকল নিয়ে যাওয়া। ডাঁই হয়ে থাকা কিছু বরফ কুচির কাছে দাঁড়ানো। দু চারটে ছবি তোলা। আর নেটওয়ার্ক পেলেই ফেবুতে সাঁটিয়ে দেওয়া। দুনিয়াসুদ্ধু লোককে জানান দেওয়া, দেখো, আমরা বরফের দেশে এসেছি। তারপর লাইক আর কমেন্ট গুনে যাওয়া। বরফকে নিয়ে আমাদের মুগ্ধতা যতখানি, আদিখ্যেতা তার থেকে ঢের বেশি।

তাই বরফ, নয় আমাকে আরও বেশি করে টানে প্রকৃতি। মোবাইল বা ক্যামেরা নয়, দেখব চোখ দিয়ে। অনুভব করব হৃদয় দিয়ে। এই ফাঁকে বরং যাওয়ার দিকনির্দেশ দিয়ে ফেলা যাক। কীভাবে যাবেন? যদি গ্যাংটক থেকে যেতে চান, দু'ঘণ্টার রাস্তা (৬৫ কিমি)। আর যদি সরাসরি নিউ জলপাইগুড়ি (শিলিগুড়ি) থেকে যেতে চান, তাহলে ১১০ কিমি। মোটামুটি সাড়ে চার ঘণ্টা। গাড়ি ভাড়াও নিতে পারেন, খরচ বাঁচাতে চাইলে শেয়ার পেয়ে যাবেন। উচ্চতা সাত হাজার ফুটেরও বেশি। ওঠার পথটা এতটাই সুন্দর, আর অন্য কোথাও না গেলেও চলবে। পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক ঝর্না নেমে আসছে আপন খেয়ালে। জানালা দিয়ে ভেসে আসছে মেঘ।

রাবাংলা একেবারেই ছোট্ট শহর। পায়ে হেঁটেই দিব্যি ঘোরা যায়। অহেতুক গাড়ি নিতে গেলে অনেক আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। পায়ে

হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান বুদ্ধ পার্কের দিকে (একান্তই যেতে না পারলে গাড়ি নিতে পারেন)। নিসর্গ তো আছেই, তার সঙ্গে চমৎকার সাজানো একটি বিশাল পার্ক। বিশাল এক বুদ্ধ মূর্তি। আর কোথাও যদি যেতে নাও পারেন, এই পার্ক ও লাগোয়া মনাস্ট্রিতে অবশ্যই যান। নামার সময় সম্ভব হলে হেঁটে নামুন। হতেই পারে, আপনার ভুড়ি হয়ে গেছে। হতেই পারে, পাহাড়ে অল্প উঠলেই হাঁপিয়ে যান। কিন্তু নামার সময় তো আর ঝক্কি নেই। বৃষ্টির ভ্রুকুটি না থাকলে তাই হেঁটেই নামুন। ইচ্ছেমতো দাঁড়িয়ে পড়ুন। এই দোকান, সেই দোকানে এটা-সেটা খেয়ে নিতেও পারেন। পাইন গাছের ভেতর থেকে মেঘ ভেসে আসছে। ওই দূরে, জঙ্গলের মাঝে ছোট ছোট জনপদ উকি দিচ্ছে। একটু সন্ধের দিকে হলে, দেখতে পাবেন সামনের পাহাড়ে সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। মনে হবে, আকাশের তারাগুলো যেন মাটিতে নেমে এসেছে। গাড়িতে নামলে সেই দৃশ্যসুখ কোথায় পাবেন!

অবশ্য রাবাংলা যখন গেছেন, তখন আশপাশের জায়গাগুলো একটু ঘুরে নিতেই পারেন। সেগুলো অবশ্য হেঁটে হবে না। একবেলা না হয় একটা গাড়ি নিয়ে নিন। রালং, ডলিং, টুমলং মনাস্ট্রি ঘুরে নিতে পারেন। কাছেই টেমি চা বাগান ঘুরে আসতে পারেন। আরও অনেক অজানা জায়গা আছে। অন্তত দু'দিন না থাকলে জায়গাটা ভালভাবে ঘোরা হবে না। যদি লম্বা ছুটি থাকে, নামচি, পেলিংয়েও দু'-এক দিন সময় কাটিয়ে আসতে পারেন। যদি মনে করেন, শুধু রাবংলা থেকেই ফিরে আসবেন, তাতেও ক্ষতি নেই।

দীপাবলি সংখ্যা

- কথামৃতর ইতিকথা
- ন্যানোর আত্মকথা
- রাজনীতি, বিনোদন
- খেলা, ভ্রমণ
- স্পেশ্যাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস

২৪ অক্টোবর, ২০২২

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in